দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ১৭ জানুয়ারি, ২০২২।। ৩ মাঘ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার নেতাজী সুভাষ

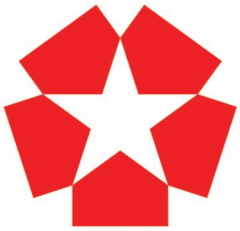

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®

CENTURYLAMINATES®

CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM®

CENTURYMDF®

CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ৩ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৭ জানুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'– বাংলার 'ধর্মক্ষেত্র' 'কুরুক্ষেত্র' 'ভোটক্ষেত্র' ।। নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ।। ৬

মোদীর অপমান ও বাংলার গর্ব ।। সুন্দর মৌলিক ।। ৭

ছাঁচে না ফেলে ভারতের জন্য আইন তৈরি করুন ।। অর্ঘ্য সেনগুপ্ত ।। ৮

দেশদ্রোহিতা ও চাটুকারিতা — অবনতির পথে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ।। বিশ্বামিত্র ।। ১০

স্বাধীনতার আগেই নেতাজীকে খুন করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ।। সুজিত রায়।। ১১

ভারত স্বাধীন হয়েছে নৌসেনা বিদ্রোহের অভিঘাতে ।। প্রণব দত্ত মজুমদার ।। ১৩

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে পরিপক্ব রাজনীতিক হন সুভাষচন্দ্র ।। দীপক খাঁ ।। ১৫

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে নেহরু ব্রাত্য এবং বিতর্ক ।। মণীন্দ্রনাথ সাহা ।। ১৭

মহানিষ্ক্রমণের আগে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নিয়েছিলেন নেতাজী ।। নিখিল চিত্রকর ২৩

নেতাজীর বিবাহের গল্প একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ।। শ্যামল পাল ।। ২৪

স্বামী বিবেকানন্দ ও বেণীমাধব দাসের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র নেতাজী হয়েছেন ।। রাজদীপ মিশ্র।। ২৭

ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দুবার দেখা হয়েছিল ।। মন্দ্রিকা গোস্বামী ৩০

বাঙ্গলার আলপনার চিহ্ন-সংকেত ।। ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ।। ৩১

এক মহাজীবন, দানবীর রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ।। মন্দার গোস্বামী ।। ৩৩

পাক থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া পক ।। দুর্গাপদ ঘোষ ।। ৩৫

আসন পুনর্বিন্যাস জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।। বিনয়ভূষণ দাশ ।। ৩৮

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝলক ।। প্রোজ্জ্বল মণ্ডল ।। ৪৪

প্রহসন আর ভাঁওতা দিয়েই চলছে এই রাজ্যের সরকার ।। বিশ্বপ্রিয় দাস ।। ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র ১৯-২০।। অঙ্গনা ২১ ।।সুস্বাস্থ্য ২২ ।।নবাঙ্কুর ৪০-৪১ পুস্তক প্রসঙ্গ ৪৩ ।। সংবাদ প্রতিবেদন ৪৭ ।। স্মরণে ৪৮ ।। চিত্রকথা ৫০

প্রকাশিত হবে ২৪ জানুয়ারি ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৪ জানুয়ারি ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

সারা দেশে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। আগামী ২৪ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে স্বস্তিকা প্রকাশ করবে অমৃত মহোৎসবের বিশেষ সংখ্যা। লিখবেন— দত্তাত্রেয় হোসবালে, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, সুজিত রায়, বিমল শংকর নন্দ প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ্য এই পত্রিকার দাম ৫০ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার **২৪ জানুয়ারি ২০২২** তারিখের সংখ্যাটি **স্বাধীনতার ৭৫ বছর অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে** বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির **মূল্য ৫০.০০ টাকা**। এই তথ্যবহুল সংখ্যাটি অধিকাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য সহযোগিতা করুন। আপনার কত কপি প্রয়োজন আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জানান যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঠিকমতো আপনাকে পাঠাতে পারি।

যোগাযোগ—
শ্রীজয়রাম মণ্ডল, মো: ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

সম্পাদকীয়

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

বীর প্রসবিণী ভারতজননী। এই দেশের মাটিতে যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে, তেমনই বীর ও যোদ্ধারাও জন্ম লইয়াছেন। দেশ ও জাতির উপর যখনই কোনও বিপত্তি নামিয়া আসিয়াছে, তখনই সাধু-সন্ন্যাসী ও বীর যোদ্ধারা তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রেরণা ও আশীর্বাদ লইয়া বীর যোদ্ধারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন এবং অবহেলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। দেশমাতৃকাকে তাঁহারা গর্ভধারিণী জননীরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পৃথ্বীরাজ চৌহান, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি দুর্গাবতী, গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং নাম না জানা অসংখ্য বীর ও বীরাঙ্গনা তাঁহাদের বলিদানের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছেন। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের সম্পূর্ণ পরিবার বা বংশকেও আহুতি দিয়াছেন। ভারতজননীর এই রকম একজন বীর সন্তান হইলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন তাঁহারই শিক্ষক বেণীমাধব দাস। বেণীমাধব দাসের প্রত্যক্ষ প্রেরণা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রভাবে তিনি দেশমাতৃকার একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবকে পরিণত হইয়াছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের একটি 'উদ্দেশ্য' রহিয়াছে। দেশ হইতে বিদেশি শক্তিকে বিতাড়নের জন্য তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত বাধিয়াছিল। তিনি বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, আবেদন-নিবেদন, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নীতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত পন্থা নহে। কংগ্রেস সেইখানে শুধুমাত্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে কথা বলিত, সুভাষচন্দ্র সেইখানে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলিতেন এবং তাহা যেকোনও উপায়ে। কংগ্রেসের মধ্যে কোণঠাসা হইয়া তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়াছেন। অবশেষে বৈদেশিক সহায়তায় সৈন্যবলে সজ্জিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির ভিত নাড়াইয়া দিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রদূত। তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করিয়া লইয়াছেন। ইহা ভারতের কায়েমি স্বার্থান্বেষী নেতৃবর্গ মানিয়া লইতে পারেন নাই। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা অনবরত তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়াছে। তাঁহাকে বিদেশের দালাল বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে ভারতবাসীর চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার 'বিবাহের গল্পের' অবতারণা করা হইয়াছে। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা তাঁহার জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে উপলব্ধিই করিতে পারে নাই অথবা তাহাদের সেই বোধশক্তি ছিল না। কীরূপে দেশ স্বাধীন হইবে এবং দেশ স্বাধীন হইলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো কীরূপ হইবে তাহা তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনার উপর জোর দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিঋণ মকুব, গ্রামের মানুষের সহজে ঋণ পাইবার ব্যবস্থা, জমিদারি প্রথার বিলোপ, সস্তায় মুলধনের ব্যবস্থা, সমবায় ব্যবস্থার প্রসার এবং কৃষিই যেহেতু দেশের মূল উপজীব্য তাই বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার কথা।

বস্তুত, নেতাজী ছিলেন দেশভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। ভারতীয় সংস্কৃতি থেকেই তিনি ভারতের পুনর্গঠনের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে দেশনায়ক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর এতগুলি বৎসরে তাঁহার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নাই। তাঁহার নাম ব্যবহার করিয়া রাজনীতি করা হইয়াছে মাত্র। অত্যন্ত সুখের বিষয়, অনেক বিলম্ব হইলেও দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মদিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন।

সুভাষিতম্

সত্যেনোৎপদ্যতে ধর্মো দয়াদানেন বর্ধতে।

ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্মো ক্রোধোলোভাদ্‌বিনশ্যতি।।

ধর্ম সত্য থেকে উৎপন্ন হয়, দয়া ও দান থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ক্ষমার মাধ্যমে স্থির হয় এবং ক্রোধ ও লোভের কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

‘চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে’

বাঙ্গলার ‘ধর্মক্ষেত্র’ কুরুক্ষেত্র’ ‘ভোটক্ষেত্র’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দু’বছর ধরে প্রকৃতি পরীক্ষা নিচ্ছে। অনেকটাই দিশেহারা বিজ্ঞান। নাজেহাল মানুষ। ধৈর্যের খেলায় প্রকৃতির কাছে প্রতিদিন দশ গোল করে খাচ্ছে মানুষ। প্রকৃতির কাছে মানুষ যেমন শিখছে, তেমন শিখছে বিজ্ঞান। মাত্র পাঁচহাজার বছরের মানব সভ্যতার নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে ৩৫০ কোটি বছরের প্রকৃতির জীবাণুরা। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাষায় এটাই ‘আধিভৌতিক’- এর খেলা। আমফান, যশ হলো ‘আধিদৈবিক’। আর আমাদের দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট ‘আধ্যাত্মিক’। এটাই ত্রিতাপ, তাই ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

কলকাতা উচ্চ আদালত শর্তাধীন তিন সদস্যের নজরদারি কমিটি গড়ে এবছরের গঙ্গাসাগর মেলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী আছেন। সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য সচিব আর মানবাধিকার কমিশনের সদস্য। অতিমারীতে এর বেশি কিছু আশা করা যেত বলে আমার মনে হয় না। কিছুদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলাকে ‘দুয়োরানি’ আর কুম্ভমেলাকে ‘শুয়োরানি’ বলেছেন। ভাবনাচিন্তা করেই তা বলেছেন। তবে ‘দুয়োরানির’ দুয়োত্ব ঘোচানোর জন্য মমতা কেন্দ্রের কাছে নির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কেবল একটি সেতু তৈরির জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সাহায্য চেয়েছেন যা তাদের টেবিলে পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে দুয়োরানির দুয়োত্ব ঘোচানোর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে সেসব তোয়াক্কা না করে মমতা প্রতি বছর রাজ্য বাজেটে মেলা বাবদ খরচের জন্য কয়েশো কোটি টাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

তাহলে মমতা গঙ্গাসাগরকে হঠাৎ দুয়োরানি বললেন কেন? রাজনৈতিক মহল বলছে, ‘হিন্দু ভোটকে জাপটে ধরে রাখার জন্য’ নাকি ‘সংখ্যালঘু তোষণের’ তকমা মুছে ফেলার জন্য মমতা এসব বলছেন? বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত কলকাতার একটি নামি কাগজে লিখেছিলেন রাজ্য নির্বাচনে কীভাবে ৮ শতাংশ হিন্দু ভোট মমতার দিকে চলে গিয়ে বিজেপির ভরাডুবি ঘটায়। তাতেই বোধ হয় ভোল পালটেছে মমতা বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। লেখায় স্বপনবাবু জানিয়েছিলেন রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু (৫০ শতাংশ) বিজেপির দিকেই আছে।

১৯৭৭ থেকে ৩৪ বছর ধরে সিপিএমের কাছে ধর্ম ‘আফিম’ ও ‘ব্যক্তিগত’ বিষয় ছিল। তাতে কেন্দ্র সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। সংঘাত হলে কেন্দ্র সরকার রাজধর্ম পালন করেছে। তাই ৩৪ বছর ধরে সিপিএমের কাছে এই মেলা ছিল ‘কেন্দ্র সরকারি ক্ষেত্র’ বা কবিগুরুর ভাষায় ‘চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে’ গোছের অভিশপ্ত কোনও অনুষ্ঠান। ভাবটা ছিল মেলা না হলেও কিছু যায় আসে না। পাঁচটাকা করে তীর্থকর বসিয়েছিল সিপিএম। তা থেকে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা রোজগার হতো। ধর্মের সঙ্গে সরকারের সাযুজ্য আছে বলে মানত না সিপিএম। আমি কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদকে বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী বলেই মনে করি। আমার ব্যক্তিগত মতে কারও কিছু যায় আসে না। ধর্ম থেকে নিজেদের জোর করে বিচ্ছিন্ন রাখতে গিয়েই কলকাতায় রিজওয়ানুর মৃত্যুকাণ্ডে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সিপিএম। সেই পতনের সঙ্গে যুক্ত হয় কৃষিজমির ভুল ব্যবহার। ‘প্যাক অব কার্ডস’-এর মতো ধসে পড়ে সিপিএম।

২০১১-তে তিন দশকের সিপিএম জমানা উলটে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দল। পালটে যায় রাজ্যের ধর্মীয় সমীকরণ। মমতার কাছে ধর্ম ‘সামাজিক’ ও ‘ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা’-র জায়গা। কল্যাণমূলক সরকারের নৈতিক কর্তব্য তাকে আগলে রাখা। ভারত বহুত্ববাদী দেশ। সে কর্তব্য অবশ্যভাবে পালন করা উচিত। অনেকের মতে মমতার কাছে এই মেলা যেমন ‘সামাজিকীকরণের’ জায়গা, তেমনই আবার ‘ভোটক্ষেত্র’ও বটে। তাই বোধ হয় শুয়োরানি- দুয়োরানির উদাহরণ।

বিজেপির কাছে ধর্ম হলো বহুমাত্রিক। তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থল। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে জড়িত। ধর্মকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা যায় না। তা যেকোনও ধর্ম হতে পারে। তাদের কাছে যেকোন্য ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের শামিল। কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগরও তাই।

বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ পেতে যে কোনো নতুন সদস্যকে দলের ৪ নং ধারা মেনে এবং ফর্মে সই করে ‘ সর্বধর্ম সমভাব ও ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতা’র শপথ, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। লিখতে হয় ‘আমি সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং দেশের ধারণাকে সমর্থন করি যা ধর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়’। এনিয়ে অনেকে ঠাট্টা মশকরা করে। সব জেনে না জানার ভান করেন। বামপন্থীরা বিজেপিকে ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের যন্ত্র হিসেবে দেখেন। সিপিএমের মতো মমতা অতিসরলীকরণ করেন না। প্রয়োজনে বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ বলেন। বিজেপি নেতারা পিছু না হটে মমতাকে তুষ্টিকরণ বা ধর্মীয় তোষণের কাণ্ডারি বলেন। তারা এই রাজ্যে তিন ধরনের আইনের উদাহরণ দেন— ১) মমতার পরিবারের জন্য আইন, ২) প্রশাসনের আইন এবং ৩) তুষ্টিকরণের আইন।

রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে নয়ের দশকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিজেপিকে হনুমানের দল বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। সুর নরম করে জ্যোতিবাবু বাজপেয়ীাকে বলেছিলেন ‘আপনি বলে দিন বিজেপিকে কাদের দল বলতে হবে।’ দু’দশক পরে জ্যোতি বসুর দল এ রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে সাইন বোর্ডে পরিণত হয়েছে আর রাজ্য বিজেপির গ্রাফ সাধারণভাবে উপরে উঠে রয়েছে। □

মোদীর অপমান ও বাংলার গর্ব

মাননীয় মমতা দিদি,

দিদি, আপনার করোনা রাজনীতি আমার হেব্বি লাগছে। বিশ্বাস করুন দিদি, আমার আক্রান্ত হতে ইচ্ছে করছে। ভাবছি কটা দিন ঘরবন্দি না হয় থাকব কিন্তু আপনার পাঠানো নৈবেদ্য তো পাওয়া যাবে। ছবি দেখছি আপনি কেমন ঝুড়ি করে ফল পাঠাচ্ছেন অনেকের বাড়িতে। ফল খেতে আমি একদম পছন্দ করি না। সে না হয়, আপনার ফল বিলিয়ে দেব। কিন্তু আপনার দেওয়া ওই কার্ডটা যত্ন করে বাড়িতে রেখে দেব। ওটা দেখিয়ে গর্ব করে বলব, দেখ, প্রধানমন্ত্রীকে দিদি পাত্তা না দিলেও আমায় দেন। দিদি সৌজন্য দেখানোর জন্য আমার মতো সাধারণ মানুষকে কত গুরুত্ব দিচ্ছেন। অথচ তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময়ে সম্বোধন পর্যন্ত করেন না। একেই বলে তৃণমূল স্তর। হে হে, দিদি আপনি সত্যিই আমার গর্ব, বাংলার গর্ব, ভারতের গর্ব।

ওই তো সেই দিনের কথা বলছি দিদি। আমার তো অনেককাল ওই গর্বের দিনটার কথা মনে থাকবে। হয়তো কোনোদিনই ভুলতে পারব না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমন ভার্চুয়াল অপমান হয়তো আর কেউ করে দেখাতে পারেনি। সেদিন আমি প্রথম ভাবছিলাম, বিজেপি নেতা হলেও মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে অপমান করা মানে প্রধানমন্ত্রী পদটাকে অপমান করা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো উলটো দিকে যখন দিদি বসে আছেন তখন প্রধানমন্ত্রী আবার কে! আমার মুখ্যমন্ত্রী দিদির চেয়ে কেউ বড়ো হতে পারেন না। হতেই পারেন না।

আমি সেদিন টিভির সামনে বসেছিলাম। ভার্চুয়াল মাধ্যমে রিমোটের বোতাম টিপে কলকাতার চিত্তরঞ্জন কানসার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। সেই অনুষ্ঠানে আপনিও ছিলেন। দিদি, আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন আমার প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী। খুব আশা নিয়ে সেই অনুষ্ঠান দেখতে বসেছিলাম। তখনও জানতাম না যা চাই তার থেকেও বেশি কিছু পাব। মনে আছে, ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর।

তবে আমার গর্বে বুক ফুলে উঠল যেই সময়টায় সেটা বলি দিদি। আপনি বললেন, ‘‘আমি এখানে উপস্থিত থেকেছি প্রধানমন্ত্রীর জন্য। কারণ বাংলার একটি হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে দুবার ফোন করেছিলেন। বাংলার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এজন্য ধন্যবাদ।’’ এর পরই আপনি বললেন,‘‘কিন্তু আমি এখানে উল্লেখ করতে চাইব, এই ক্যাম্পাসের উদ্বোধন আমরা আগেই করে দিয়েছি। কারণ কোভিডের প্রথম তরঙ্গের সময় আমাদের বেশি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দরকার হয়েছিল। তখনই একদিন আমি নিউ টাউনের এই হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস দেখি এবং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই। আমরা এখানে সেফ হোম তৈরি করি। এই ভবনটি আমাদের খুব কাজে এসেছে।’’

দিদি, এটা নিয়ে সবাই সমালোচনা করছে। এই যে আপনার উদ্বোধন রাজনীতি সেটা নিয়ে সবাই প্রশ্ন তুলছে। প্রধানমন্ত্রী যে ভবনের উন্মোচন করছেন তা যে আপনি একদিন ইচ্ছে হলো বলে করে দিয়েছেন যেটা বলা যায়! অনেকেই বিস্মিত। কেউ কেউ বলছেন, কেন্দ্র যেখানে ৭৫ শতাংশ টাকা দিয়েছে যেখানে আপনি বা রাজ্য সরকার কোন অধিকারে উন্মোচন করে দিলেন! তাও আবার গোপনে!

আসলে দিদি এখানেই আমার গর্ব। এখানেই আমার মনে হয় আপনি আলাদা। আপনি সবার চেয়ে আলাদা। আপনি এইভাবে করতেও পারেন আবার বলতেও পারেন। এই জন্যই তো এগিয়ে বাংলা! □

অতিথি কলম

অর্ঘ্য সেনগুপ্ত

ছাঁচে না ফেলে ভারতের জন্য আইন তৈরি করুন

দেশের স্বাধীনতার দিবসের বক্তৃতায় প্রথম প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সামগ্রিক ভাবে বলেছিলেন 'আসুন আমরা সকলে সততা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই অভিযানে যোগ দিই...'। এই অভিযান যা তাঁর কথায় ছিল অ্যাডভেঞ্চার, তার বয়স আজ ৭৫ হলো। আশা করব আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী অতীতের কথা স্মরণ রেখে আমাদের বর্তমান নাগরিকদের একটি আলোচিত SARAL দ্রুততম বিচার পদ্ধতি নির্মাণে সচেষ্ট হবেন।

আদালতে মামলা গেলেই সাধারণ মানুষ উকিলবাবুদের ভাষা বা তাদের দিয়ে যে সমস্ত কাগজপত্র সই করানো হয় তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। এখানে কিন্তু নিতান্ত অশিক্ষিত মানুষের কথা বলা হচ্ছে না। যারা কিছুটাও লেখাপড়া জানেন তাদের কাছে আইনের পরিভাষাগুলি দুর্বোধ্য ঠেকে। না বুঝেই সাধারণত সই করতে হয়। এই সূত্রে ২০১১ সালে ভারতীয় সংসদে ৪১টি আইন চালু নয়তো সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যের হয়ে গর্ভধারণ করা থেকে জলপথে পণ্য পরিবহণের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের বহু আইন। এই একই সময়ে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত তাদের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ৮৬৬টি বিভিন্ন ধরনের রায়দান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এদের মধ্যে ছিল তীব্রভাবে বাদানুবাদে ভরা, যুক্তি ভিন্নযুক্তি নিয়ে লড়া সরকারের তরফে ট্রাইবুনাল গঠন করার মামলাটি। একইসঙ্গে গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রমোটারদের কায়দা করে ক্রেতাদের বঞ্চিত করার মামলাও। তারা জটিল ভাষায় ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তির মধ্যে নিজেদের স্বপক্ষে ধারা ঢুকিয়ে দিত।

বাস্তবে যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সর্বত্র আইনের বিরাট প্রভাব রয়েছে, তবুও এই ২০২১ সালেও বরাবরের মতো আইন প্রণয়নের সময় দেশের নাগরিকদের মধ্যে আলোচনার থেকে আইনবেত্তাদের আধিপত্যেই সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়েছে। কেবলমাত্র ৩টি কৃষি সংক্রান্ত আইন যা মানুষের মধ্যে বিপুল চর্চিত হয়েছে সেগুলি ছাড়া আইন তৈরির বিষয়টি নাগরিকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকেছে। তারা এ আইন তৈরির আগে কোনো আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক কিছুই করতে পারেনি।

এই কৃষি বিলগুলিকে সরকার যে দ্রুততার সঙ্গে সংসদে অনুমোদন করিয়েছে সেখানেও জনমনে এই ধারণাটাই গড়ে উঠেছে যে, সরকার বোধহয় কৃষিক্ষেত্রে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিচ্ছে। আইনের ভিতরে কী রয়েছে তা নিয়ে এদের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সঠিক কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। আইনের সঙ্গে নাগরিকদের এই যে বিযুক্ত করে রাখা এটি কিন্তু আকস্মিক নয়। এটি একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলেছে। ঔপনিবেশিক ভারতে সকলেই জানেন যে আইনের ভাষা কঠিন ছিল। আর সে ছিল এমন ইংরেজি যে তৎকালীন ভারতেও ইংরেজি বলতে লিখতে পারা ভারতীয়রাও মাথামুণ্ডু কিছুই সহজে বুঝতে পারত না। সাধারণত অব্যবহৃত শব্দ কিংবা লাটিন ভাষার শব্দকে ঢেলে ব্যবহার করার চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। mut at is mutandis, ipso facto প্রভৃতি শব্দ শুনলেই সাধারণ ইংরেজি জানা মানুষও ঘাবড়ে যেত। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আর একটি বাঁশ। বাক্য রচনা করা হতো আমার্জনীয়ভাবে দীর্ঘ পদ্ধতিতে। আর এই দীর্ঘায়ত বাক্যগুলি রচনা করে রচয়িতারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বলতেন এরই নাম খাঁটি আইনি মুসাবিদা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ধরনের আইনি কচকচিময় লেখা পত্র এক ধরনের বিশেষ উন্নাসিক ইংরেজ আইনজ্ঞ শ্রেণীই বুঝতেন আর লেখাগুলি তাঁদের মনোমতো করেই তৈরি হতো।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতার এই ৭৫ বছর পূর্তির সময়েও আমরা সেই একই পদ্ধতিতে আমাদের বিশাল এই বহুভাষিক দেশের আইন প্রণয়ন করে চলেছি। শুনলে অবাক হবেন এই প্রথা-প্রণালী, ভাষা প্রয়োগ কত যে সেকেলে ও তাঁবাদি হয়ে গেছে যে যেখান থেকে এর জন্ম হয়েছিল সেই খোদ ইংল্যান্ডও একে পরিত্যাগ করেছে। তারা একেবারে লাটিন বিযুক্ত করে যে কোনো অজ্ঞ ইংরেজের বোধগম্য ভাষায় আইন প্রণয়ন করছে।

এই সূত্রে ২০২২ সাল থেকে ভারতের আইনি ভাষার সরলীকরণ খুবই প্রয়োজন। এটি SARAL হোক— simple, action-

able, Reasomed, accessible, Laws. আইনটি এমন সরলভাষায় প্রণীত হোক যেখানে বহু ভাষাভাষী ভারতের যে কোনো প্রাদেশিকভাষায় তা সহজে অনুবাদ করা যায়। আইনের সারাৎসারগুলি থেকে সহজে প্রমাণ করার বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের উকিলের নিরপেক্ষভাবে বোঝার (সর্বদা যুক্তি নির্ভর। কোনো আন্দাজের ভিত্তিতে নয়) সুযোগ যেন থাকে। সর্বোপরি, এই ডিজিটাল যুগে আইনগুলি যেন কমপিউটার পাঠ্য হয়। ভাবুন, তিনটি কৃষি আইনে যে বিষয়গুলি রাখা হয়েছে সেটি যদি আইনের এই ধারা আদতে অন্য যে কোনো বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও যেমন রাজ্য এপিএমসি আইনের যে ধারা বর্তমানে বলবৎ আছে তাকে অমান্য করবে। এর জায়গায় যদি লেখা হতো 'নতুন আইনের কোনো ধারায় যাই লেখা থাক না কেন ধান ও গমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহয়াক মূল্য এখন চাষিরা যা পাচ্ছেন তা তেমনি পাবেন।' এর ফলে বিল তিনটির সারবস্তু সহজবোধ্য হতো। অহেতুক সন্দেহ ও সরকারের ওপর অবিশ্বাসের বাতাবরণ কেটে যেত। এমনকী অতিদীর্ঘ মারমুখী প্রতিবাদ আন্দোলনকেও হয়তো এড়ানো যেত।

এই SARAL প্রস্তাবটি কেবল মাত্র আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আইনকে যে অধিকাংশ সময় সাধারণের অগম্য মনে হয় তার একটা অন্য কারণ হচ্ছে আইনকে ব্যাখ্যা করে যে ভাষায় রায়দান করা হয় বা আইনের ভাষ্য দেওয়া হয়, তা মামলাকারী বা অভিযুক্ত কারুরই বৌদ্ধিক স্তরের মধ্যে থাকে না। প্রথম থেকেই আইনি প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়িত করে রাখা হয়। বিগত ১০ বছরের সর্বোচ্চ আদালতের রায়গুলি পড়লেই জানা যায় রায় কত দীর্ঘভাবে লিখিত হয়। এই দীর্ঘ পাতা ভরা রায় দেওয়াটা যতটা না আইনি বাধ্যবাধ্যকতার মধ্যে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি এটি অভ্যাসবশত লেখা হয়।

অতীত মামলার অসম্পাদিত দীর্ঘ রায়ের উল্লেখ, অযাচিত বিদেশি আইনের টানাপোড়েন, উকিলবাবুদের বাদানুবাদের হুবহু বিশদ কপি পেস্ট করে রায়ের কপিকে ভারাক্রান্ত করা সুঅভ্যাস নয়। অথচ এগুলিই ভারতীয় রায়দানের পদ্ধতিকে গ্রাস করেছে।

এই পটভূমিতে ১৯৫১ সালে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের 'চম্পকম দোগরিয়ারাজন' মামলার রায়টি স্মরণীয়। এটি ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসাক্ষেত্রের কলেজগুলিতে আসন সংরক্ষণ করার সাংবিধানিক যৌক্তিকতা নিয়ে প্রথম মামলা। মামলার নিষ্পত্তি করে মাত্র ৪ পাতার রায় দেওয়া হয়েছিল। এরই বিপরীতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) সংরক্ষণের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে ১৯৯২ সালের ইন্দ্র সাহানি মামলার রায়ের দৈর্ঘ ছিল ৫৫৬ পাতা। এর মানে এই নয় যে শেষ মামলাটির বিষয়বস্তুর জটিলতা বা রায়দানে আইনি বাধ্যকতা বা মামলার চরিত্রগত ফারাক বেশি ছিল।

আসলে ততদিনে রায়দান করার পদ্ধতি বিশেষ করে রায় লিখন পদ্ধতিকে সংক্ষেপিত করতে কোনো প্রচেষ্টাই নেওয়া হয়নি। দীর্ঘায়িত লিখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের মান্যতাকে ২০২২ সালে সময়োপযোগী হয়ে উঠতে গেলে শুধু রায়দান সংক্ষেপ করাই নয়, রায়ের ওপর আবেদন করার প্রাসঙ্গিকতাকে মানতে হবে। কেননা আবেদনের প্রশ্নটি ওঠে গতির কারণে অর্থাৎ আইনি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যখন রায় বেরোচ্ছে ততদিনে কালক্ষেপের ফলে মামলার কারণটিও অপ্রসাঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ২০২১ সালে মামলার সংখ্যা ৬৫০৮৬ থেকে বেড়ে ৬৯৮৫৫ দাঁড়িয়েছে। এই ঝুলে থাকা মামলাগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বৈধতা সংক্রান্ত বিষয়ও রয়েছে, যেমন ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসেবে মান্যতা বা ফোনে আড়িপাতা নিয়ে Pegasus মামলা।

কিন্তু একই ভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ সেই অজস্র মামলাগুলি অসংখ্য জামিন আবেদন, সম্পত্তি বিরোধ, অপরাধ সংক্রান্ত অ্যাপিল মামলাগুলি যা যুগব্যাপী বন্দি হয়ে রয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের হাতে। যার সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়ে আছে অগণিত মানুষের জীবন, জীবিকা ও ভাগ্য। এটা কি সত্যি নয় যে দীর্ঘ বিলম্বিত ন্যায় বিচার বাস্তবে মানব জীবনে তার তাৎপর্য হারায়? সেই কারণে ২০২২ সালে বকেয়া মামলার পাহাড়কে ফয়সালার পথে নিয়ে যাওয়া যাতে আদালতের অর্থপূর্ণ প্রভাব পড়ে বাদী-বিবাদীর বা সামগ্রিক জনজীবনে (পিএলআই ক্ষেত্রে)। এই সূত্রে ছোটো আকারে রায়দান লিখিত করলে অনেক সময় বাঁচবে। একটি দীর্ঘ রায় লেখার সময়ে অন্য পাঁচটি লেখা হয়ে যেতে পারে।

দেশের স্বাধীনতার দিবসের বক্তৃতায় প্রথম প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সামগ্রিক ভাবে বলেছিলেন 'আসুন আমরা সকলে সততা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই অভিযানে যোগ দিই...'। এই অভিযান যা তাঁর কথায় ছিল অ্যাডভেঞ্চার, তার বয়স আজ ৭৫ হলো। আশা করব আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী অতীতের কথা স্মরণ রেখে আমাদের বর্তমান নাগরিকদের একটি আলোচিত SARAL দ্রুততম বিচার পদ্ধতি নির্মাণে সচেষ্ট হবেন।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক ও 'বিধি'র প্রতিষ্ঠাতা)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

দেশদ্রোহিতা ও চাটুকারিতা— অবনতির পথে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম

এবার এই প্রশ্নটা সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতার মান কেন অবনতির পথে ধাবিত হচ্ছে, এ নিয়ে আগেও স্বস্তিকার পাতায় বহুবার লেখা হয়েছে। কিন্তু ইদানীংকালে তার যে রূপ দেখা দিচ্ছে, তাতে দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে তো হবেই। কিন্তু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের সেইসঙ্গে যে নৈতিক মানের অবনমন দেখা যাচ্ছে, সেই ব্যাধি সারানোর জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে কোনো বন্দোবস্ত নেই, এটাও দুর্ভাগ্যের। প্রচার সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ পত্রিকা বলে দাবি করা একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রভাতী বাংলা দৈনিকে একটি প্রবন্ধের সঙ্গে ভারতের বিকৃত মানচিত্র ছাপা হয়েছে। এই দুষ্কর্ম ওই পত্রিকার নকশালি সম্পাদকীয় দপ্তর আগেও বহুবার করেছে, এনিয়ে স্বস্তিকায় বহু প্রতিবেদনে তা উল্লেখও করা হয়েছে। এবারে তরুণ আইনজীবী তরুণজ্যোতি তেওয়ারি একটি আইনি নোটিশ দিয়ে ওই সংবাদমাধ্যমের কর্তৃপক্ষকে জানান যে মানচিত্রটি তাঁরা ছেপেছেন তা ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, কাগজের কপি দিয়ে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। এই এক পত্রাঘাতেই অবশ্য কাজ হয়ে যায়। পত্রিকাটি পরের দিন ক্ষমা চেয়ে হাস্যকর একটা কুযুক্তি দেয়। রঙের ব্যবহারের ত্রুটির কারণে নাকি এই অনিচ্ছাকৃত ভুল। এই পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল না এমনটাই দাবি করে বিষয়টি মিটিয়ে দেয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। এখন সমস্যাটা হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ভুল আর ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধানটা বোঝা দরকার। সাম্প্রতিক অতীতে জে এন ইউতে ভারতবিরোধী স্লোগান থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো অজুহাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে মদত যুগিয়ে যাওয়া, জনমতকে প্রভাবিত করা— সেই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই ফসল হচ্ছে ভারতের বিকৃত মানচিত্রের অর্থাৎ কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে ভারতের মানচিত্রের ছবি ছাপা। এবার নেহাত আইনি মারপ্যাঁচে পড়ে গেছে বলে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মে এই পত্রিকাটির অতিবাম সম্পাদকীয় দপ্তরের কোনো মদত থাকবে না, এটা হতে পারে না।

যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রীর কনভয়কে আটকে দেওয়া হলো পাঞ্জাবের রাস্তায়। উল্লাসের সুর শোনা গেল ওই সংবাদমাধ্যম আর পশ্চিমবঙ্গে একদা ক্ষমতাসীন, বর্তমানে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই দেশের রাজনীতিতেও অপ্রাসঙ্গিক একটি রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে। আসলে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি আর প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিমানুষের দলীয় সত্তা— এই দুটোকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা আমাদের গণতন্ত্রের শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের আড়ালে মুখ লুকিয়ে কেউ বিস্মৃত হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাদের মূল লক্ষ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নন, তাঁকে সামনে ঢাল করে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদের সাহায্য করে ভারতকে অশান্ত করা। সাংবাদিকতার এই দেশদ্রোহী চরিত্র যেমন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে, অন্যদিকে সাংবাদিকতায় চাটুকারিতার তাল-মাত্রা লোপ পাচ্ছে। ফলে বহু ব্যবহারে ক্লিশ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ঘুণ ধরেছে, যা ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও শুভ ইঙ্গিত নয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পরেই যার স্থান, শাসকদলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি বলেছেন আগামী দুমাস রাজ্যে সবকিছু বন্ধ রাখা উচিত। খুব ভালো কথা। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটি যদি সত্যিই তা চান, তবে তিনি ইচ্ছা করলেই রাজ্যের আসন্ন পুরনির্বাচন স্থগিত রাখতে পারতেন। আচ্ছা সেটা না হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কেটে পড়া গেল। কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলা? রাজ্যে শাসক দলের নেক্সট টু সুপ্রিমো সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের অনুরোধ উপেক্ষা করে এমন সাধ্য আছে কার? আসলে পুরোটাই আই ওয়াশ। তৃণমূল নেত্রী বুঝেছেন, তাঁর এতকালের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের ফলে তাঁর গদি এখন টলমলে। তাই হিন্দুদের নাকের বদলে নরুন দিয়ে তাঁকে কিছু একটা করতেই হতো। আর সেটা করতে গিয়ে তিনি লাখো মানুষকে যে বিপন্ন করছেন, তার দিক থেকে নজর ঘোরাতেই বিজেপি মুখপত্র শমিক ভট্টাচার্যের ভাষায় 'ফেস সেভিং' নিজের ভাইপোকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। যেমন পুরনির্বাচনে তিনি কোথাও সন্ত্রাস হবে না বলে হাততালি কুড়িয়েছিলেন। তারপর নিচুতলার কর্মীরা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতেই 'তৃণমূল জিতল, তিনি হারলেন' বলে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম তাদের চাটুকারিতার সীমা অতিক্রম করেছিল। এর দিন পনেরো-কুড়ি পরেও ছবিটা হুবহু একই রয়ে গেল। তিনি আগামী দুমাস সবকিছু বন্ধ থাক বলায় সংবাদমাধ্যমের সেই একই চাটুকারি ভঙ্গি, এমনকী ডাক্তারদের মাঠে নামাতেও পিছপা হননি। কিছু বৈদ্যুতিন মাধ্যম আবার এমনও প্রচার করছে যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সংক্রমিতের হার খুব কম, কিন্তু সব কিছু বন্ধ থাকতে বলে তিনি কত মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন! প্রশ্ন উঠছেই, যখন সংক্রমণের হার বাড়ছিল জানুয়ারি মাসের প্রথম দু'দিন সেখানে স্টেডিয়ামে বহু লোকের সমাগমে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হল কেন? এই প্রশ্নগুলো তোলার সাহস কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনো সংবাদমাধ্যম দেখাচ্ছে না। এটাই দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের। □

ন্যায্য প্রশ্নগুলো তোলার সাহস কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনো সংবাদমাধ্যম দেখাচ্ছে না। এটাই দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের।

স্বাধীনতার আগেই নেতাজীকে খুন করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার

সুজিত রায়

সুভাষচন্দ্র বসু তখন কাবুলে মৌলভি জিয়াউদ্দিন নামের ছদ্মবেশে। অপরিসীম চেষ্টা করছেন, কোনোভাবে রাশিয়া হয়ে জার্মানিতে অনুপ্রবেশের। ১৯৪১ সালের সেই বিপজ্জনক অন্তর্ধান যাত্রায় ব্রিটিশ সরকারের এক নম্বর শত্রু 'বোস'-এর তখন একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ভগৎরাম তলোয়ার। ভগৎরাম অতি সাধারণ এক ছোট্ট ঘরে সুভাষকে লুকিয়ে রেখে নিজেই 'অলিভার' ছদ্মনামে হাজির হয়েছেন রাশিয়ান দূতাবাসে যাতে নেতাজী রাশিয়ায় সামরিক আশ্রয় পান। স্তালিন রাজি হলেন না। ভগৎরাম দুশ্চিন্তায় দৌড়লেন ইতালির দূতাবাসে। বলা হলো, অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যেই এক গোয়েন্দা পুলিশের নজরে পড়ে গেলেন ভগৎরাম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একদিন নয়, পরপর তিনদিন। তখন নেতাজীর পরিচয় বোবা কালা 'চাচাজী'। ভগৎরাম প্রমাদ গুনলেন। এখানে আর নয়। নতুন বাসার সন্ধান করতে হবে। সাময়িকভাবে সবজি বাজারের কাছে আশ্রয় একটা মিলল বটে কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়াতে পারলেন না সুভাষ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুলিশের নজর এড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে উঠলেন ভগৎরামের বন্ধুস্থানীয় এক স্থানীয় দোকানদার উত্তমচাঁদের বাড়িতে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কারণ উত্তমচাঁদ ছিলেন নেতাজী ভক্ত কাবুল নিবাসী ভারতীয়। কিন্তু একদিন পরেই বিপদের আশঙ্কা ঘনিয়ে এল, যখন দেখা গেল উত্তমচাঁদের বাড়িরই এক ভাড়াটে পেশোয়ারি হিন্দু রোশনলাল আচমকাই উধাও। তারিখ ১৯৪১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি। ভগৎরাম রীতিমতো চিন্তিত। রোশনলাল কি চিনে ফেললেন নেতাজীকে? বন্ধু হাজি আবদুল শোভানের সঙ্গে আলোচনা করে নেতাজীকে সব জানানো হলো। সুভাষও ভগৎরামের মতকেই সমর্থন করলেন। ঠিক হলো আস্তানা পালটানো হবে। এবার ঠিকানা হবে দর্যা চকের সরাই— জাজিয়ান। ওইদিন বিকেলেই আশ্রয় নেওয়া হলো একটা ছোট্ট ঘরে। দুটি খাটে দুজনের বিশ্রামের ব্যবস্থা।

আফগানিস্তানের পেশোয়ার থেকে কাবুল যাত্রা এবং কাবুল ছেড়ে নিরুদ্দেশের

একথা কি মেনে নেওয়া সম্ভব যে ভারতীয় কংগ্রেসি ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ইন্ধন ছাড়াই ব্রিটিশ সরকার এমনভাবে নেতাজীকে 'ছোটো' করতে চেয়েছিল? না, এটা সেযুগে সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না বলেই নেতাজী সুভাষের যাবতীয় ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁকে হেয় করেছিলেন গান্ধী থেকে জওহরলাল সকলেই এমনকী বল্লভভাই প্যাটেলও। সবটাই দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের ফসল, যাতে নেতাজী কখনও ভারতবর্ষের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা হয়ে উঠতে না পারেন।

পথে পা বাড়ানোর আগে পর্যন্ত বিদেশ থেকে ভারতকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার প্রচেষ্টায় এইভাবেই পদে পদে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর নজরদারি এড়াতে হয়েছে নেতাজীকে। নচেৎ অনেক আগেই হয়তো অনেক বড়ো বিপদের মুখে পড়তে হত তাঁকে। কী সেই বিপদ?

অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না বা গল্পকথা বলে উড়িয়ে দেবেন যে, কলকাতা থেকে ৫২ জন পুলিশের নজর এড়িয়ে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই ব্রিটিশ সরকারের অবিরাম চেষ্টা ছিল সুভাষ কোনো বিদেশি শক্তির কাছে পৌঁছনোর আগেই তাঁকে খুন করে লাশ গায়েব করে দেওয়া। এবং প্রবল চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে কাবুলের মাটিতেই তাঁর কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নেতাজী বিষয়ক তথ্যের ভাঁড়ারে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রের অধ্যায় এবং সেই অধ্যায়ের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও যে বড়ো ধরনের হস্তক্ষেপ ছিল কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাতেও তারও প্রমাণ মিলেছে। আক্ষরিকভাবে না হলেও ব্রিটিশ সরকারের এই ষড়যন্ত্রের নামকরণ হয়েছিল— Operation Liquidate Netaji--অপারেশন নেতাজী হত্যা।

ঠিক যেমনভাবে ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষাকারী ঐতিহাসিক ও গবেষকরা বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ গান্ধীপূর্বজ কংগ্রেসি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার ও খুনের ঘটনা চেপে গিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে নেতাজীকে কাবুলের মাটিতে খুন করার চক্রান্তটাও ধামাচাপাই রাখা হয়েছে এবং হয়তো তা কোনোদিনই প্রকাশ্যে আসত না যদি না

ট্রিনিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইউনান ও' হালপিন (Unan O'Halpin) তাঁর 'আয়ারল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম' বিষয়ক গবেষণা করাকালীন তুরস্কের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত একটি গোপন নথির সন্ধান পেতেন। সময়টা ২০০৫ সাল।

কী সেই গোপন নথি?

গোপন নথিটি ছিল ইউনাইটেড কিংডম হোম ডিপার্টমেন্ট তথা ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের একটি গোপন সার্কুলার। আরও স্পষ্টভাবে বললো, ব্রিটিশ সরকারের গোপন গোয়েন্দাবাহিনী স্পেশাল অপারেশনস এক্সিকিউটিভ (SOE)-কে পাঠানো একটি রেডিয়ো মেসেজ—ভারতবর্ষের সুভাষচন্দ্র বোস গোপনে কায়রো-ইস্তানবুলের পথে চলেছেন শত্রুদেশ জার্মানির উদ্দেশে। তাকে যেখানেই পাও, হত্যা কর। Liquidate him নির্দেশটি পাঠানোর তারিখ—৭ মার্চ ১৯৪১। এর আগেও পাঠানো হয়েছিল একই নির্দেশ। তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। পরপর দুবার।

কিন্তু না, আন্তর্জাতিক শক্তিধর দেশ হয়েও ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে ছুঁতে পারেনি। এমনকী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোপন সহযোগী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় কিছু নেতারও সমস্ত আশা বিফলে গিয়েছে, তাঁরা আগেই চেয়েছিলেন নেতাজীকে ব্রিটিশ বাহিনীর যুপকাষ্ঠে বলি দিতে। জওহরলাল নেহরু তো বারেবারেই বলেছিলেন নেতাজীকে তরবারি হাতে প্রতিহত করতে হবে। ভারতীয় বামপন্থীরা বলেছিলেন নেতাজীকে প্রয়োজনে বুলেটবিদ্ধ করতে হবে। হিটলারের মতো বা জাপানের তোজোর মতো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে তাঁকে হাত মেলাতে দেওয়া যাবে না। অতএব বলাই বাহুল্য যে তাঁরা হয়তো ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এইসব প্রচেষ্টার কথাই অবগত ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বশংবদ নিলর্জ্জ দেশদ্রোহীর দল সেকথা কখনই প্রকাশ না করে চিরতরে নেতাজীর ভারতে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু বিমানবন্দরে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার পিছনেও যে ১৯৪১-এর ষড়যন্ত্রই কাজ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। কারণ হত্যাকারীরা বরাবরই চেয়েছিল, নেতাজীকে খুন করা হোক বিদেশের মাটিতে। তাহলে তাঁকে চিরতরে বিশ্বরাজনীতির মঞ্চ থেকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। দূর হবে পথের কাঁটা। সমাজবাদ, সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের নামে দেশমাতাকে লুটেপুটে খাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে—একদিকে গান্ধীজীর হত্যা এবং অন্যদিকে নেতাজীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত তাদের সফল হয়েছে এবং সেই সাফল্যের সদ্ব্যবহারও তাঁরা করেছেন প্রাণ ভরে। যে ভারতকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শখচিত ভারতবর্ষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নেতাজী, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে চক্রান্তকারীদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে।

কিন্তু নেতাজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র কি এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল? সম্ভবত না। কারণ তাইহোকু বিমানবন্দরে নেতাজীর বিমান ভেঙে পড়ার আগে বারবার বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়া এবং বিপজ্জনকভাবে নেতাজীকে নিয়ে দীর্ঘ আকাশপথ পাড়ি দেওয়াটাও যে সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ ছিল না সেকথা কি হলফ করে কেউ বলতে পারে? কারণ একই বিমানের বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের কাছে বিমানটির অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ার ঘটনাটি শুধু অভূতপূর্বই ছিল না, ছিল বিস্ময়কর। ওই দুর্ঘটনা নিয়ে বারেবারে তদন্ত কমিশন বসেছে। সেই কমিশনগুলির তদন্ত রিপোর্টও সরকারের কাছে জমা পড়েছে কিন্তু তদন্ত কমিশনের রিপোর্টগুলি প্রসঙ্গে নেতাজীর অনুগামী, সহকর্মী এবং নেতাজী ভক্তদের বক্তব্যকে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছে প্রকৃত তথ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার। এমন অনেক উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে রয়েছে।

ইউনান ও' হালপিনের এই যুগান্তকারী তথ্য সেটাই প্রমাণ করে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ১৯৪১ সালে ষড়যন্ত্র তথ্য ভারত সরকারের নজরে এলেও তা ২০০৫ সালের আগে প্রকাশিতই হলো না। তাও বিদেশি গবেষকের সৌজন্যে। কে জানে এ যাবৎ অপ্রকাশিত হাজার হাজার নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল মানুষের সামনে আরও কত তথ্য উজাড় করে দেবে!

নেতাজীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনায় হয়তো এখানেই ইতি টানা যেত যদি না লন্ডনস্থিত ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার হতো আরও একটি ফাইল। নং R/3/2/20 India Office Library এখন যা ব্রিটিশ পাঠাগারের একটি অংশ বলে স্বীকৃত। ব্রিটিশ সরকারের সেই রিপোর্টে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে কূলকিনারা করতে না পেরে লেখা হয়েছিলঃ ''Subhas Bose is temperalmental and suffers slightly from megelomaniac. At the age of 16 he left home and went on a pilgrimage to the holy places of India. A month prior to his release from fail in December last he commenced reading 'Gita' and 'Chandi'. He sent for the 'bagehal' (tigers skin) from his house and hung a curtain up in his room in the Jail. Behind the curtain he used to sit in the morning and evening, apparently engaged in devotion. It is probably, Therefore, that he continued his religious practice after his release.''

অর্থাৎ, সুভাষ বোস ছিলেন মেজাজি, অহংকারী ও কর্তৃত্ববাদী। ধর্মাচরণের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিই তাঁকে ঘরছাড়া করেছে।

একথা কি মেনে নেওয়া সম্ভব যে ভারতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ইন্ধন ছাড়াই ব্রিটিশ সরকার এমনভাবে নেতাজীকে 'ছোটো' করতে চেয়েছিল? না, এটা সেযুগে সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না বলেই নেতাজী সুভাষের যাবতীয় ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁকে হেয় করেছিলেন গান্ধী থেকে জওহরলাল সকলেই, এমনকী বল্লভভাই প্যাটেলও। সবটাই দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের ফসল, যাতে নেতাজী কখনও ভারতবর্ষের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা হয়ে উঠতে না পারেন।

নেতাজীর খুনের চক্রান্ত ছিল সেই প্রচেষ্টার এক মারাত্মক রূপ। ▫

ভারত স্বাধীন হয়েছে নৌসেনা বিদ্রোহের অভিঘাতে

প্রণব দত্ত মজুমদার

গান্ধীজীর পথে অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইনঅমান্য ইত্যাদি আন্দোলন করে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না সুভাষচন্দ্র। তাই জাপানি সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ-দখলে থাকা এলাকায় ব্রিটিশ বাহিনীকে আঘাত হানলেন এবং অনেক এলাকা দখল করতে করতে ভারতের সীমানায় পৌঁছে গেলেন। কোহিমা, ইম্ফল (যা এখন নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে) দখল করে নেয় আজাদ হিন্দ বাহিনী। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠা করা হয় নেতাজীর নেতৃত্বে। জাপানিরা আগেই আন্দামান ও নিকবোর দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল। জাপান সরকার এই দ্বীপগুলি নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়। নেতাজী এদের নাম দিয়েছিলেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ। বিশ্বের ১১টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বাধীন সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ওই দেশগুলিতে আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাসও স্থাপিত হয়েছিল। কারেন্সিও ছাপা হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার বলা যেতে পারে। আর নেতাজী সুভষ ছিলেন সেই সরকারের প্রধান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবরের যে অপরিসীম গুরুত্ব তা কি এই দিনটিকে দেওয়া হয়েছে? ভারতের মতো কদর্য রাজনীতির দেশে নেতাজী এখনো তাঁর যথার্থ সম্মানটুকু পাননি। কমিউনিস্ট রাশিয়া তখন ইম্পিরিয়ালিস্ট ব্রিটেনের হাত ধরেছে, কাজেই এই যুদ্ধ তখন ভারতীয় কমিউনিস্টদের তত্ত্বে জনযুদ্ধের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর নেতাজী যেহেতু জার্মান- জাপানির সহায়তায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের চোখে হয়ে গেলেন ঘৃণিত ব্যক্তি। ভারতীয় কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে জাপানি প্রধানমন্ত্রী 'তোজোর কুকুর' আখ্যা দিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন জাপানি সাহায্যপুষ্ট সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রবেশ করলে তাঁকে তলোয়ার নিয়ে বাধা দেবেন। সেদিনের আপোশকামী স্বার্থসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতারা সুভাষচন্দ্রের 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র কৌশলী বৈপ্লবিক পদক্ষেপটি বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। আর নয়তো তাঁদের চিন্তা ও বুদ্ধির দৈন্যদশার কারণে তাঁরা নেতাজীর এই কৌশল বুঝতে পারেননি।

১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে জাপানিরা পরাজিত হতে থাকে। অবশেষে মিত্র পক্ষের শরিক আমেরিকা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে ১৯৪৫ সালের ৬

ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে মিত্রশক্তির কাছে। স্বাভাবিক ভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী যারা জাপানের সহায়তায় লড়ছিল তাদেরও আত্মসমর্পণ করতে হলো। ঠিক হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবারও আত্মগোপন করবেন। তার আগে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় ২৩০০০ বীর সৈনিকের উদ্দেশে এবং ইস্টএশিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের উদ্দেশে তার বিশেষবার্তা রেখে গেলেন—'Sister and Brothers ! In this unprecedented crisis in our history, I have only one word to say. Do not be depressed at our temporary failure. Be of good cheer and keep up your spirits. Above all, never for a moment falter in your faith in India's destiny. There is no power on earth that can keep India enslaved. India shall be free and before long.' তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ। তার এই বার্তার দু বছরের মাথায় ভারত স্বাধীন হয়েছিল; তাও সে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিঘাতেই।

তাঁর আত্মগোপনের পর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকে মনে করেন ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট জাপানের টোকিয়ো যাওয়ার পথে তাইওয়ানের তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আবার বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কমিশনের (১৯৯৯-২০০৫) মতে ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার এই রায়কে মান্যতা দেয়নি। অনেকেই মনে করেন নেতাজীর মৃত্যুরহস্যের মধ্যে নেহরুর চক্রান্ত আছে। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সবজনগ্রাহ্য সমাধান এখনো হয়নি।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে, ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে সেই বাহিনীর বীর সেনাপ্রধানদের

নেতাজীকে অপ্রাসঙ্গিক করে না দিলে জওহরলাল নেহরু সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারতেন না। কংগ্রেসও তলিয়ে যেত অনেক আগেই।

যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়ার জন্য দিল্লির লালকেল্লায় তাঁদের বিচার আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক যুদ্ধ ও আত্মবলিদানের কথা সারা ভারতের গোচরে এলো। সারা দেশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। লালকেল্লায় তাঁদের শাস্তি দানের জন্য বিচার হচ্ছে দেখে ভারতের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, চারিদিকে তীব্র বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে গেল। হাজার হাজার ভাই বন্ধু সহকর্মী দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তার জন্য তাঁদের বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করছে ব্রিটিশ প্রভু, এটা আর মেনে নিতে পারলেন না ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেশাত্মবোধ তাঁদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেল। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। প্রথম বিদ্রোহ করলো নৌবাহিনী, ক্রমে তা পদাতিক ও বিমান বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল। এ যেন দ্বিতীয় মহাবিদ্রোহ। ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমন করতে পারলেও এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষমতা তাদের নেই, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সারা ভারতের জনতার বিক্ষোভ। ভারতীয় সেনাদের তুলনায় ইংরেজ সেনার সংখ্যা ভারতভূমিতে অনেক কম ছিল তাই ইংল্যান্ড থেকে সেনা আমদানি করে এতবড়ো ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা যে কঠিন এটা উপলব্ধি করতে পারল ব্রিটিশ শাসন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সেই আর্থিক ক্ষমতাও আর তাদের ছিল না। বলা যায় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। তা নাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশ যে কিনা ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারতছাড় আন্দোলন নির্মম ভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল এবং বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যখন গুটিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছিল তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কি অলৌকিক কারণে ভারতবর্ষকে তড়িঘড়ি স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করেছিল? আধুনিক গবেষকদের লেখা থেকে তার কারণটি পরিষ্কার পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর জাস্টিস পি বি চক্রবর্তী ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণ জানার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কাছে। সুভাষচন্দ্র বসুর আইএনএ- এর বিচারের ফলে যে সেনাবিদ্রোহ হয়েছিল তার থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিই তাঁদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার কারণ বলে তিনি স্বীকার করেন। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে গান্ধীজীর ভূমিকা জানতে চাইলে তিনি অবজ্ঞাসুলভ বক্রোক্তি করে বলেছিলেন—m-i-n-i-m-a-l. অর্থাৎ গান্ধীজীর ভূমিকাকে তিনি নগণ্য বলেছিলেন।

অর্থাৎ আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাতই ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল এবং তার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন ভাইসরয় ওয়েভেল লিখেছিলেন, 'এই প্রথম একজন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিবিদ সেনাবাহিনীতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন আর ফল হলো সাংঘাতিক।' মাইকেল অ্যাডওয়ার্ডস লিখেছেন, 'গান্ধীজী বা নেহরুজী ব্রিটিশ সরকারের কাছে তখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বোস।' সুতরাং স্বাধীনোত্তর পর্বে নেতাজীকে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বহীন করে রাখার দায় জওহরলাল নেহরুর ওপরেই বর্তায়। নেতাজীকে অপ্রাসঙ্গিক করে না দিলে তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারতেন না। কংগ্রেসও তলিয়ে যেত অনেক আগেই। □

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে পরিপক্ক রাজনীতিক হন সুভাষচন্দ্র

দীপক খাঁ

চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে অভাব অনটনের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা জানকীনাথ বসু নিজ প্রচেষ্টায় কটক শহরে একজন খ্যাতিমান উকিল হয়ে ওঠেন এবং ১৯৩৬ সালে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে তিনি রায় বাহাদুর খেতাব পরিত্যাগ করেন। এহেন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সৎ, উদার, দানশীল ব্যক্তি ছিলেন সুভাষ চন্দ্রের পিতা। মোট আট ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে দুই ভাই ও চার বোনের মৃত্যু ঘটে ছেলেবেলাতেই। পাঁচ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত সুভাষের পড়াশোনা কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুলে।

১৯০৯ সালে তিনি ভর্তি হন র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস প্রথম সুভাষচন্দ্রের সুপ্ত প্রতিভাকে অনুভব করেছিলেন। কিশোর সুভাষের উপর তার প্রভাব পড়েছিল। তিনি সুভাষকে শিখিয়েছিলেন সৎ ও নির্ভীক হতে। এই সময় সুভাষচন্দ্র তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পেলেন। তা পড়ে তিনি অনুভব করেন এমনই একজন মানুষের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ। তিনি স্থির করেন স্বামীজীর আদর্শেই হয়ে উঠবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ত্যাগের মধ্য দিয়েই জীবনের প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। মাছ, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। দামি পোশাক ছেড়ে সাধারণ মানের পোশাক পরতে থাকলেন। গভীর রাতে উঠে যোগ সাধনা করতেন। ওড়িশার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দীন দুঃখী মানুষের সেবা করতে লাগলেন। বাড়ির সকলে তার এই আচার আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত

করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন সুভাষচন্দ্র। ছেলের এহেন উন্নতি দেখে জানকীনাথ ঠিক করেন কটকের পরিবেশ থেকে সুভাষ চন্দ্রকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ পড়বার জন্য ভর্তি হলেন। এখানে এসে কয়েকজন বন্ধু সহযোগে শিক্ষার প্রসার ও জনসেবার আদর্শ গ্রহণ করেন। মূলত মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলত, কোন পথে চললে পাওয়া যাবে জীবনের পরম সত্যকে। মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন গ্রামে গঞ্জে দুঃখী মানুষের সেবায়। কখনো বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের কাছে। একবার তিনি জানতে পারলেন, কোনো একটি গ্রামে কলেরা দেখা দিয়েছে, তিনি একটি হোমিওপ্যাথির বই আর কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন গ্রামের পথে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের সেবা করতে আরম্ভ করলেন। এদিকে তার বাড়ির সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। ভারতবর্ষের মানুষ কী নিদারুণ কষ্টের মধ্যে বাস করছে---তা তিনি দেখলেন। তিনি লিখছেন— "আমাদের বাড়ির সামনে একটি বুড়ি ভিক্ষা করত..... পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। বুড়ির দুঃখ জীর্ণ চেহারাটা যতবার দেখতুম ততবারই ওর কথা ভেবে মন বেদনায় ভরে উঠত। আমি আরামে দিন কাটাচ্ছি আর এই বেচারার না আছে খাওয়া পরার সংস্থান, না মাথা গোঁজবার ঠাঁই। জগতের দুঃখ দারিদ্র যদি নাই-ই ঘুচল তবে যোগ সাধনার কী সার্থকতা?"

এই নিদারুণ যন্ত্রণার কারণে সুভাষচন্দ্র যখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, এই সময় ইন্দ্রদাস বাবাজী নামের এক পাঞ্জাবি সাধুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সুভাষচন্দ্রের মনে হল সন্ন্যাস জীবনের মধ্যেই আছে মুক্তির সন্ধান। ১৯১৪ সালের গুরুর সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরে বেড়ালেন হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন—কিন্তু কোথাও তিনি মনের শান্তি পেলেন না। কাশীতে এসে দেখা হল রামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনিই সুভাষচন্দ্রকে বুঝিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠালেন।

কলকাতায় এসে আবার পড়াশোনায়

মন লাগালেন কিন্তু আই. এ. পরিক্ষায় ভালো ফল করতে পারলেন না। দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ওটেন সাহেব। ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের জন্য ছাত্ররা তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। একদিন কয়েকজন ছাত্র কলেজের গেটে ওটেন সাহেবকে মারধর করে। কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। অবশেষে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ সালে বি.এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

সুভাষচন্দ্র পরিবারের সবার ইচ্ছা অনুযায়ী ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে মাত্র ৮ মাস পড়াশোনা করে এই পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মানসিকভাবে সন্তুষ্ট হলেন না। ভর্তি হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে থেকে বি.এ পরীক্ষায় পাশ করলেন। বিলেতে একের পর এক ডিগ্রি নিলেও অন্তরে শান্তি পাচ্ছিলেন না সুভাষচন্দ্র। বারবার প্রশ্ন উঠছিল মনে—ইংরেজদের দাস হয়ে মোটা মাইনের চাকুরি আর নিশ্চিত আরামের জন্য জীবনের আদর্শকে বিসর্জন দেবেন? তাহলে তার আদর্শপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার কোনো সার্থকতা থাকবে কি?

এদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বাঙ্গলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্রের মন থেকে সব সংশয়, দ্বিধা দুর হয়ে গেল। তিনি যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে।

১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলেসের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হলো। হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ কারারুদ্ধ হলেন। কারারুদ্ধ হলেন চিত্তরঞ্জন দাশও। তাঁর অনুপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের উপর পড়ল নেতৃত্বের ভার। সুভাষচন্দ্রকেও বন্দি করা হলো। বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ড

এদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বাঙ্গলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্রের মন থেকে সব সংশয়, দ্বিধা দুর হয়ে গেল। তিনি যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে।

হলো। কারাদণ্ডের আদেশ শুনে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন—এত কম শাস্তি! আমি কি মুরগি চুরি করেছি নাকি?

১৯২২ সালে মুক্ত হলেন সুভাষচন্দ্র। প্রবল বন্যার প্রকোপে উত্তরবঙ্গ জুড়ে তখন হাহকার উঠেছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে উত্তরবঙ্গের মানুষের সেবায় ছুটে গেলেন। সেখানে কিছুদিন আর্ত মানুষের সেবায় কাজ করার পর ফিরে এলেন কলকাতায়। ১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত হলো কংগ্রেস অধিবেশন। দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠল। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন রাজনৈতিক দল স্বরাজ্য গঠন করলেন। এই দলের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সবথেকে বিশ্বস্ত সঙ্গী। দলের আদর্শ প্রচারের জন্য প্রথমে 'বাংলার কথা' পরে 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি ইংরেজি ভাষায় লেখা পত্রিকা প্রকাশ করলেন সুভাষচন্দ্র। তার কর্মদক্ষতার গুণে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা সেযুগের একটি বিখ্যাত পত্রিকা হয়ে ওঠে।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল নির্বাচনের মাধ্যমে কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ভার অধিকার করে। চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। সুভাষচন্দ্র ২৭ বছর বয়সে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হলেন। এই পদের মাইনে ছিল মাসিক ৩০০০ টাকা। সুভাষচন্দ্র তার অর্ধেক মাইনে নিতেন। সুভাষচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের যৌথ প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই কর্পোরেশনের কাজকর্মে নতুন প্রাণের সাড়া জাগাল। সর্বত্রই একটা দেশীয় মানসিকতা গড়ে উঠল। বহু অবৈতনিক স্কুল গড়ে তোলা হলো। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র তার কর্মধারাকে সম্পূর্ণ করার আগেই নতুন অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হলো। তাঁকে দেশে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। গভর্নমেন্ট তাকে কলকাতায় না পাঠিয়ে ইউরোপে যাবার অনুমতি দিল। কিন্তু এই প্রস্তাবকে সুভাষচন্দ্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এদিকে তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল। তাই বাধ্য হয়ে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রায় আড়াই বছর পর তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। ফলে বাঙ্গলার নেতৃত্বের ভার পড়ে সুভাষচন্দ্রের উপর। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মানুষকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ১৯২৯ সালে ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বলেন— স্বাধীনতা শব্দের অর্থ সকলের কাছে এক নয়। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা শব্দের মানের একটা ক্রমবিকাশ হচ্ছে। আমি স্বাধীনতা বলতে বুঝি সমাজ-ব্যক্তি, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-গরিব সকলের জন্য স্বাধীনতা। এই রাজনৈতিক যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্যের সম বণ্টন। জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নাগপাশ থেকে নিষ্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ধর্মের গোঁড়ামি থেকে উদ্ধার লাভ। □

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে নেহরু ব্রাত্য এবং বিতর্ক

মণীন্দ্রনাথ সাহা

স্বাধীনতা দিবসের ৭৫তম বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ঘটা করে পালন করছে কেন্দ্র সরকার। সেই হিসেবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিচার্সের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিংহ, সাভারকর প্রমুখের ছবি থাকলেও বাদ পড়েছে নেহরুর ছবি। যথারীতি বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস।

এ প্রসঙ্গে শশী থারুর, গৌরব গগৈদের অভিযোগ, বিজেপি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নেহরুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। শশী থারুর বলেন, 'ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে।' গৌরবের প্রশ্ন, কোন দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে তাদের প্রথম নেতাকে সরিয়েছে?' বিরোধীদের আরও অভিযোগ নেহরুর প্রতি প্রধানমন্ত্রী একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নন।

গৌরব গগৈয়ের কথামতো নেহরু দেশের একমাত্র প্রথম নেতা। এই প্রথম নেতা বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটা বোঝা গেল না। যদি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বোঝাতে চান তাহলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসবে। সেগুলো হলো, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে এবং সদ্য স্বাধীন দেশের একজন দায়িত্বশীল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। তাঁর সেই ব্যর্থতাগুলো হলো --- দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উৎপীড়িত, নির্যাতিত হিন্দুদের তিনি রক্ষা করেননি। কাশ্মীর সমস্যা তাঁরই সৃষ্টি। নেতাজী দেশে ফিরতে পারেননি তাঁরই চক্রান্তে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে জিন্না পাকিস্তানকে মুসলিম দেশ ঘোষণা করলেন অথচ নেহরু ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা না করে গণতান্ত্রিক দেশ ঘোষণা করলেন।

নেহরু সবসময় ভাবাবেগে চলতেন এবং নিজেকে বিশাল বিজ্ঞ মনে করতেন। লোকে বলে তিনি ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের কাছে, বলা ভালো লেডি মাউন্টব্যাটেনের কাছে নিজেকে বন্ধক রেখেছিলেন। এটা বলার কারণ, ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলকেই তিনি স্বাধীন ভারতের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেন কন্যা পামেলা মাউন্টব্যাটেন তাঁর লেখা বইতে লিখেছিলেন, 'আমার মায়ের প্রতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দুর্বলতা ছিল।' একজন শিক্ষিতা কন্যা তাঁর মা এবং এক দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে শুধু শুধু ওকথা লেখেননি। নেহরু নিজেকে ভারতীয় ভাবতে লজ্জাবোধ করতেন। উপরন্তু একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এমন কতকগুলো কাজ করেছেন যা তাঁর খেয়াল, সন্দেহ, ভুল, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সিদ্ধান্তহীনতা এবং অকর্মণ্যতাই প্রমাণ করে। তারই কিছু নজির নীচে তুলে ধরা হলো।

১৯৪৬ সালে জিন্নার মুসলিম লিগ যখন কলকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল তখন নেহরু মুম্বইতে জিন্নার সঙ্গে ঠাণ্ডাঘরে বসে রাজনৈতিক দরকষাকষিতে ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর মুসলিম লিগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে নির্বিচারে যে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নারী নির্যাতন চলছিল তার বিরুদ্ধে নেহরু কোনো

সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশপ্রেমী কোনোদিন অর্থ, মান, যশ, নিজ পরিবারের কথা চিন্তা করে সংগ্রাম করেননি। তাঁরা হাসিমুখে ফাঁসিকে বরণ করেছেন অথবা যাবজ্জীবন কারাগারের অন্ধকারে কুঠরিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই নেহরু সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত।

ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারী যখন লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে দাবি উঠেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হয়ে এপার বাঙ্গলায় এসেছেন তত সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক।

এতে নেহরু রেগে গিয়ে বলেছিলেন— 'এই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে তা অসম্ভব।' উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন--- 'পূর্ববঙ্গ হতে আসা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পাওয়া বন্ধ করতে হবে।'

নেহরু নেতাজীকে নিজের সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ মনে করতেন। তাই ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আইবি নেতাজীর পরিবারের ওপর কড়া নজরদারি চালিয়েছে। এই সময়সীমার ১৬ বছরই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই গুপ্তচর বৃত্তির নির্দেশ যে নেহরু দিয়েছিলেন তা জলের মতো পরিষ্কার।

১৯৪৭-এর অক্টোবরে পাকিস্তানের ট্রাইবাল আর্মি কাশ্মীরে প্রবেশ করলে সর্দার প্যাটেল ভারতীয় ফৌজ পাঠান। তাঁরা যখন পাকিস্তানি আর্মির ওপর বুলডোজার চালাচ্ছে, তখন একতরফা ভাবে যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করে কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিলেন এবং নিজে কাশ্মীরকে টেনে নিয়ে গেলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের দুই সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত (যুগান্তর) ও অপূর্ব সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার) শ্রীনগরে গিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শেখ আবদুল্লা তখন তাঁদের বলেছিলেন— 'আপনাদের ধারণা যে আমি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আমি হত্যাকারী নই, কিলার আরেকজন।' কে সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি? শেখ আবদুল্লা অবশ্য তা খোলসা করেননি। ভারতবাসীরও প্রশ্ন— কে সেই তৎকালীন ক্ষমতাধর? সন্দেহের আঙুল কার দিকে উঠছে?

স্বাধীনতা পাওয়ার পরই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ভারতকে নিউক্লিয়ারের ওপর এক্সপেরিমেন্ট ও নিউক্লিয়ার সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন, কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৫০ সালে আমেরিকা ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয় কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করে চীনের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৫৫ সালে আমেরিকা ও রাশিয়া যৌথভাবে ভারতের নাম পুনরায় প্রস্তাব করে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য। সেবারও নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হলে বিমানবাহিনী তার নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী চলতে চেয়েছিল। নেহরু তা না করে দিয়েছি। বলেছিলেন— 'আকসাই চীনের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ একগাছা ঘাসও সেখানে জন্মায় না।' পরাজয় স্বীকার করে চীনকে ৪৩০০০ বর্গকিলোমিটার জমি উপহার দিয়েছেন ভারতের তিন হাজারের বেশি সেনার মৃত্যুর বিনিময়ে।

স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম দুর্নীতির হাতে খড়ি প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে, সেনাবাহিনীর জিপ কেনার মাধ্যমে। এ বড়ো লজ্জার বিষয়।

নেতাজী যে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি, নেহরু তা জানতেন। তাই তিনি বলেছিলেন— 'সুভাষচন্দ্র বসু দেশে ফিরে এলে তাঁকে আমি খোলা তরবারি নিয়ে স্বাগত জানাব।' অর্থাৎ হত্যা করব।

নেতাজীর মতো বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি নেহরু অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর এবং ক্ষমতালোভী। নেহরু জানতেন যে, নেতাজী রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে একটি চিঠি পাঠিয়োছিলেন। তাতে লেখা হয়েছিল--- 'আপনাদের যুদ্ধাপরাধী সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায় রয়েছেন। স্ট্যালিন সুভাষকে আশ্রয় দিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধী সুভাষকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষে এ মন্তব্য বড়োই অপমানকর।

দেশভাগের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল হবিবুর রহমান ভারতে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু নেহরুর বিরোধিতায় তিনি পাকিস্তান চলে যান। পাকিস্তান সরকার হবিবুর রহমানকে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে। কিন্তু নেহরু আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানিদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ তো দূরের কথা আজাদ হিন্দ ফৌজদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। উপরন্তু নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, দেশের সেনাবাহিনীর ব্যারাক বা কোনো দপ্তরে যেন নেতাজীর ছবি না থাকে।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট সেই নাটকীয় বিমান দুর্ঘটনার পর সাত দিনের মধ্যেই জাপান সরকার সমস্ত সম্পত্তি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজেরই রামমূর্তি ও আইয়ারের হাতে তুলে দিয়েছিল। রামমূর্তি ও আইয়ার সেই সম্পত্তি নয়ছয় করতে থাকলে জাপান পরপর তিনবার ভারত সরকারকে সরকারিভাবে তা জানায়, কিন্তু নেহরু তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের পুরস্কৃত করেন। কথিত আছে, ১৯৪৬ সালে নেহরু সিঙ্গাপুর যান আসলে ওই সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে। মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে সেই সম্পত্তি ভাগ হয় এবং দুই গদ্দার রামমূর্তি ও আইয়ারও কিছু ভাগ পান বলে জানা যায়। এজন্যই কি নেহরুর পরিবারের বর্তমান সম্পত্তি ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের থেকেও বেশি?

এইসব ঘটনা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এরকম আচরণ একজন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যারা সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশপ্রেমী তাঁরা কোনোদিন অর্থ, মান, যশ, নিজ পরিবারের কথা চিন্তা করে সংগ্রাম করেননি। তাই তাঁরা হাসিমুখে ফাঁসিকে বরণ করেছেন অথবা যাবজ্জীবন কারাগারের অন্ধকারে কুঠরিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই নেহরু সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত।

শিবের বাসস্থান 'কৈলাস' নামের তাৎপর্য

মহাকাল শিবের স্থায়ী বাসস্থান 'কৈলাস' নাম নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। কৈলাস শিবের বাসস্থানরূপে বর্ণিত হিমালয়ের পর্বতের অংশ বিশেষ। বর্তমানে এটি তিব্বত-চীনের অন্তর্গত। এটির উচ্চতা সাড়ে ছয় কিলোমিটার থেকে বেশি। কৈলাসের আকৃতি বিশাল শিবলিঙ্গের মতো। যতদূর সম্ভব এরূপ বিশাল আকৃতির প্রাকৃতিক শিবলিঙ্গ বিশ্বে দ্বিতীয় নেই। মূল বিষয়ে আসা যাক।

কাল + আবাস = কালাস = কৈলাস।

এখানে 'কাল' বলতে 'মহাকাল', মানে 'শিব'। আবাস মানে বাসস্থান। অর্থাৎ কাল-এর আবাস থেকে 'কালাবাস' বা 'কালাস'। উচ্চারণ বিবর্তনে 'কৈলাস' হওয়াই স্বাভাবিক। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্ববৃহৎ শিবলিঙ্গ হচ্ছে মহাকাল-এর বাসস্থান।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

ফজলুল হক অসাম্প্রদায়িক!

প্রগতিশীল ও অতিবামপন্থী চেতনার ব্যক্তিদের কাছে শের-ই- বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। তার জন্য কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্ট সকলেই নিজেদের গর্বিত মনে করেন। এই ফজলুল হক সাহেবের হাত ধরে মুসিলিম লিগের সাধের ও স্বপ্নের পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয়। পরবর্তী সময়ে বাঙ্গলায় হিন্দু নিধনযজ্ঞ তথা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং করার সময় নির্বাক হয়ে যেতে দেখি, দেখি নোয়াখালির দাঙ্গায় নিহত হিন্দুদের জন্য মৌনব্রত ধারণ করতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথার ফুলঝুরি নিয়ে হাজির হচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সভাসমিতিতে, তাতে অবশ্য মুসলিম লিগের ও তাদের কসাইবাহিনীর, সাহসিকতার মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে।

এই ফজলুল হকসাহেব ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর, বাঙ্গলা ১৩৮০ সালের ৯ কার্তিক মধ্য রাত্রিতে বরিশালের রাজা পুরথানার সাতুরিয়া গ্রামে, মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত অর্থে তিনি রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে ঢাকার সৈয়দ আহমেদের কন্যা তথা নবাব আবদুল লতিফের নাতনি তথা খুরশিদ তালাত বেগমকে বিবাহ করেন। তালাত বেগমের গর্ভে দুই কন্যা ও এক পুত্রের জন্ম হয়। পরে এই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শান্তি পান। ১৯২৫ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন হাওড়া জেলার ফুরফুরার মওলানা সৈয়দ ইবনে আহমদের কন্যা জিন্না তুন্নেছা বেগমের সঙ্গে। এই স্ত্রী একটি এতিম মেয়ে ও বোনের মেয়েকে আপন সন্তানের মতো প্রতিপালন করেন। হক সাহেব পরে অবশ্য এদের বিবাহও দেন। হ্যাটট্রিক করার বাসনা নিয়ে তিনি ১৯৪২ সালে ৬৯ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। পাত্রীর ঠিকানা মিরাটের আবদুল গোফুরের কন্যা খাদিজা খাতুন বেগম। ১৯৪৪ সালে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই হ্যাটট্রিকের লাইনে অনেক গণ্যমান্যদের ঠাঁই আছে, আমাদের গর্ব অমর্ত্য সেনের নামতো সর্বাগ্রে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

নতুন বছরে ধর্ষিতার পোশাক নিয়ে টানাটানি বন্ধ হোক

বাংলাদেশের 'দি ডেইলি স্টার' পত্রিকায় সম্পাদকীয় পাতায় সাংবাদিক মোহম্মদ বদরুল আহসান লিখেছিলেন, 'নাকফুল হারানো রাত্রি', সেটা শুক্রবার ১৬ নভেম্বর ২০০১। তিনি বর্ণনা করেছিলেন, একরাত্রে দুইশো নারীর সম্ভ্রম হারানোর করুণ কাহিনি। ঘটনা ভোলার চরফ্যাশনের, বিএনপি-জামাত নির্বাচনে জয়ের পর। ৮ বছরের শিশু, মধ্যবয়সি পা-হারানো নারী ও ৭০ বছরের বৃদ্ধা কেউই বাদ যায়নি। ধানক্ষেত, ঝোপঝাড়, নদীর পার, খোলা মাঠ বা ঘরবাড়িতে ধর্ষণ চলে। এক বর্বরতম ঘটনা ঘটেছে এবং মুসলমান পুরুষেরা হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করেছে।'

গল্প নয়, সত্যি। দৈনিক জনকণ্ঠ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ লিখেছিল, ৯৮.৬৮ শতাংশ ধর্ষিতা মহিলা। সংখ্যালঘু এবং ধর্ষক সরকারি দলের সদস্য, মুখ্যত বিএনপি ক্যাডার্স। লন্ডনের 'দি গার্ডিয়ান পত্রিকা ২১ জুলাই ২০০৩-এ হেডিং করেছিল, 'রেপ অ্যান্ড টর্চার এম্পটিজ দি ভিলেজ' (ধর্ষণ ও অত্যাচারে গ্রাম শূন্য)। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে এলে আমরা তাঁকে একটি কমিশন গঠনের অনুরোধ করি, তিনি তা করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কমিশন প্রায় ১৮ হাজার কেস চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্টভাবে ৫ হাজার কেসের মামলার সুপারিশ করেছিল। কেউ কিছু করেনি?

২০০১-এ ভোলা ছিল মৃত্যুপুরী। বহুদিন ধরে ভোলার এমপি তোফায়েল আহমদ। একটা সময় ছিল যখন আমরা আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও আমির হোসেন আমুকে নেতা মানতাম। ২০০১-এর পর দুই দশক অতিক্রান্ত, তোফায়েল আহমদ কিচ্ছু করেননি। তাঁর মুখ থেকে মানুষ তেমন কিছু শুনেনি। এতবড়ো একজন নেতা এলাকাবাসীর চাপা কান্না শুনতে পেলেন না, ভাবতে দুঃখ হয়? সরকারের সদিচ্ছা হয়তো নেই, তিনিও উচ্চবাচ্য করেননি, অথচ সংখ্যালঘু ভোট পেয়েছেন ১০০ শতাংশ। তোফায়েল আহমদ এখন বয়োবৃদ্ধ, রাজনীতিতে অনেকটা অবহেলিত।

বছরের শেষদিনে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ দৈনিক ভোরের কাগজ হেডিং করেছে, ২০২১ সালে ধর্ষণের শিকার ৭৭৪ শিশু, যৌন হয়রানি ১৮৫ এবং নিহত ৫৯৬। আইন ও সালিস কেন্দ্রের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, ৭৮টি শিশু বলাৎকারের শিকার হয়েছে। এতো গেল শুধু শিশু! এ সংগঠন

ফঃ ৩

তাদের জানুয়ারি-জুন বুলেটিনে বলেছে, ওই ৬ মাসে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ৮১৮, ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল ১৮৩, ধর্ষণের পরে মৃত্যু ৩১, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা ৮। অংকের হিসেবে পুরো বছরে সবকিছু প্রায় দুইগুণ হবার কথা। আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেনি, কতগুলো ধর্ষণের বিচার হয়েছে।

নতুন বছরে (২০২২) 'বিচার চাহিয়া' কাউকে লজ্জা দেওয়ার দরকার নেই। এরচেয়ে বরং ধর্ষিতার দোষ ধরুন, পোশাকের সমালোচনা করুন। ধর্ষণ আমাদের দেশে এখনো তেমন মারাত্মক অবরাধ বলে গণ্য হয় না। জজ কামরুন্নাহারের কথা মাত্র সেদিনের বনানীর হেইনট্রি হোটেলের ধর্ষণের মামলার রায় গেছে ধর্ষিতার বিপক্ষে। সেইসঙ্গে জজ কামরুন্নাহার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধর্ষণের পর ৭২ ঘণ্টা পার হলে যেন ভিকটিমের মামলা নেওয়া না হয়, কী বিচিত্র এ দেশ। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা গর্ব করি এবং ধর্ষিতার পোশাক নিয়ে টানাটানি করি।

পূর্ণিমা রানি শীলের মা বলেছিল, 'আমার মেয়েটি ছোটো, তোমরা একজন একজন করে যাও'। ছোট্ট পূজার কথা আমরা ভুলেই গেছি, বিচারের কোনো নিউজ দেখিনি। ভারতে আসিফা ধর্ষণের পর বাংলাদেশের সব মানুষ, বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। আসিফা ন্যায়বিচার পেয়েছিল। বাংলাদেশে 'পাশে দাঁড়ানো'র ক্ষেত্রে দৈন্যতা আছে, আমরা আগে ধর্ম দেখি। সন্ত্রাসের যদি কোনো ধর্ম না থাকে, ধর্ষকেরও ধর্ম থাকা উচিত নয়। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। ধর্ষণ হলে রাস্তায় নামুন, বিচার করুন। ২০২২-তে 'ধর্ষকের দেশ' বাংলাদেশ শুনতে চাই না।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

ভোটার কার্ডে আধার লিঙ্ক

'ভারতবর্ষ সূর্যের একনাম/আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে'— এই আমাদের দেশ। যার নাম ভারতবর্ষ। ভরত রাজার নামানুসারে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। সেই দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তিনি বেশ কয়েকটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার মধ্যে নোটবন্দি, ব্যাঙ্কের বইয়ে আধার লিঙ্ক, রেশন কার্ডে আধার লিঙ্ক। এবার হতে চলেছে ভোটার কার্ডে আধার লিঙ্ক। নোটবন্দিতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা হয়নি, দু' নম্বরি অসৎ উপায়ের টাকা খালে বিলে পড়ে থাকতে দেখেছি আমরা। তাই ভোটার কার্ডে আধার লিঙ্ক এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। বিরোধীরা কেন মানতে চাইছে না, বুঝতে পারছি না। ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্য ভুয়ো ভোটার ধরা পড়বে। তাই এটা ওনারা চাইছেন না।

উল্লেখ্য, ডেরেক-ও-ব্রায়েন, সৌগত রায়, অধীর চৌধুরী, অখিলেশদের মতো নেতাদের কাছে ক্ষমতাই হলো শেষ কথা। এরজন্যই এত গাত্রদাহ। বিরোধী দলের বিরোধিতার জন্য এনআরসি চালু করা যায়নি। ডান বামের অঙ্গুলি হেলনে এনআরসিকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে রেল জ্বালিয়ে ও বাস জ্বালিয়ে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছিল। তাতে কোনো আফশোস হয়নি! তথাকথিত ডান-বাম নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের। ওদের আফশোস ও অভিযোগ হলো, বিএসএফের বর্ডার এলাকায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র সরকার ঠিক তখনই। দেখলাম, অপর্ণা সেন নামে এক বুদ্ধিজীবী মিডিয়ার সামনে সেজেগুজে বসে বিএসএফ সম্পর্কে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। গণতান্ত্রিক দেশ বলেই এরাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের মুখে বেলাগাম মন্তব্য করতে হবে! যা কখনই শোভনীয় নয়। এদের জন্যই চীন ও পাকিস্তান সাহস পায়।

এদিকে এদেরই দলের (কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট কক্ষে গিয়ে স্পিকারের দিকে চেয়ার ও বই ছুঁড়ে মারছে। মনে হয় যেন কলেজের পিছন বেঞ্চের ছাত্র। তারা ভুয়ো ভোটারদের আগলে রাখতে চান ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার জন্য। এদের গদির লোভ এমনই যে, নিজের দেশকে অন্য দেশের হাতে লিজে তুলে দিতেও পিছপা হন না। এরা পাকিস্তানি পন্থী নেতা।

উল্লেখ্য, আমাদের প্রতিবেশী দুটি দেশ ভারতের সঙ্গে সবসময় শত্রুতা করে চলেছে। দেশভাগের পর থেকে নানান ভাবে শয়তানি করে যাচ্ছে যার প্রতিফলন অবৈধ অনুপ্রবেশ। যা বন্ধ হবার কোনো নাম নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের এমপিরা বাংরবার সভাকক্ষে দাবি করে আসছে বাঙ্গলা সন্ত্রাসীদের আঁতুড়ঘর। বারংবার তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রশাসনের উদাসীনতায়। খাগড়াগড় কাণ্ড-সহ মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রতিটি জেলায় জেহাদিদের মাথাচাড়া দেবার খবর মিডিয়া বারবার তুলে ধরছে। সবার মনে আছে নিশ্চয়ই, বিগত কিছু বছর আগে পার্লামেন্টে হামলা ও তাজ হোটেলে হামলা হয়েছিল। লকডাউনেও সেনাবাহিনীর উপর হামলা, কাশ্মীরে দখলের চেষ্টা, সন্ন্যাসী হত্যার মতো ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। চীনা পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে গেছে। ভারতের বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা দিয়েছে পাবজি গেম, টিকটকের মতো মারণ খেলার শিকার। হ্যাকাররা সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হ্যাক করা নিচ্ছে। সেই টাকা চলে যাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনের ফান্ডে। এর পিছনে পাকিস্তানের মদত। উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ ভারত ধ্বংসের চক্রান্ত। ভাবুন, এই অবৈধ অনুপ্রবেশ লাফিয়ে লাফিয়ে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। নেতারা সব জেনেও চুপচাপ।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ বলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণে কোনো লাগাম নেই। বর্ডার টপকে অনুপ্রবেশী ভারতে এসেই ভোটার তালিকায় নাম সহজেই সংযুক্ত করতে পারছে মোটা টাকার বিনিময়ে আর আধার কার্ড, রেশন কার্ড ফটাফট বের করে নিচ্ছেন। তাই সবদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ভোটার কার্ডে আধার লিঙ্ক যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত। ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা চিহ্নিত হলেই দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে অনুপ্রবেশী জঙ্গিরা।

—**রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

সচেতনতার আলোয় আলোকিত হোক মেয়েরা

অনামিকা দে

বছর বারোর বাচ্চা মেয়েটা বুঝতেই পারে না যে হঠাৎ কয়েকটাদিন তার ঠাকুরঘরে ঢোকা বন্ধ কেন। মাসের ওই কটা দিন কাকিমা ওঁর বিছানায় বসতে দেয় না, কেমন যেন সবাই দূরে দূরে থাকে। নিজের জামা-কাপড় নিজেকেই ধুয়ে শুকোতে হয়। মনে মনে ভাবে কী জানি এটা কি আমার নতুন কোনো রোগ? কী অদ্ভুত রোগ রে বাবা! প্রত্যেক মাসেই প্রায় পাঁচদিন খেলাধুলো বন্ধ। একদম ভালো লাগে না অদিতির। যদিও বাড়ির বড়োরা ওকে বুঝিয়ে বলেছে এটা মেয়েদের রোগ। কিন্তু শত জিজ্ঞাসা করেও কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পায় না অদিতি। মা বললেন, সচেতন হও। প্রায় হাজারটা 'করা' ও 'না-করা'র গণ্ডিতে বেঁধে দেওয়া হলো ওই বারো বছরের মেয়েটিকে। বেশ কিছু বিধিনিষেধ চাপলো তার সঙ্গে। মাসের ওইকটা দিন অদিতির নিজেকে মনে হতো অপবিত্র।

যখন নবম শ্রেণী তখন বছর পনেরো বয়স, অদিতি প্রথম পাঠ্য বইতে এই বিষয়ে পড়লো। প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওষুধের দোকান থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে গেল অদিতি। এতদিন বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল দোকানে গিয়ে ওইটি কেনার ক্ষেত্রেও। কী অদ্ভুত আমাদের সমাজ! যা একটি চিরাচরিত বাস্তব, যা বিজ্ঞান, প্রকৃতির নিয়ম, তাই নিয়েও মানুষের কত যে অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস। আর ভাবতে অবাক লাগে রীতিমতো শিক্ষিত পরিবারেও একই চিত্র, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই।

অদিতি আহমেদাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার সময় তুহিন পাল (বর্তমানে অদিতির স্বামী)-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা দুজনে নতুন কিছু আইডিয়ার সঙ্গে কিছু প্রজেক্ট শুরু করে। আইডিয়াটা ছিল মাসিক বা মেনস্ট্রুয়েশান নিয়ে রিসার্চ এবং সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি সামাজিক বিভিন্ন স্তরে। তারা প্রথমে বহু ডাক্তার ও বহু মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সমীক্ষা করেছিল। অবশেষে একটা অভিনব পদ্ধতিতে সচেতনা বৃদ্ধির উপায় ঠিক করলো তারা, কমিক বই। তিনজন যুবতী মেয়ে ও একজন ডাক্তার মুখ্য চরিত্রে রইলো কমিকের। অদিতি একটা ওয়েবসাইটে কমিকটা আপলোড করলো, www.telesofchange.in। ২০১২-র নভেম্বরে অদিতি তার স্বামীকে নিয়ে শুরু করলো মেনস্ট্রুপিডিয়া। এই ওয়েবসাইটের কাজ মূলত এই সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বায়োলজিকাল উত্তর এবং এই সম্বন্ধে যত অন্ধবিশ্বাস ছড়ানো আছে সমাজে, তার সবকিছুর সঠিক ব্যাখ্যা। সবটাই কমিক ক্যারেকটারের মাধ্যমে। এই কমিকস্ ১৪টি ভাষায় রয়েছে এবং ১৮-র বেশি দেশে এটা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। অদিতি ও তুহিন উত্তর ভারতের পাঁচটা রাজ্যের স্কুলগুলোতে এই কমিকস্‌বুক ডিসট্রিবিউট

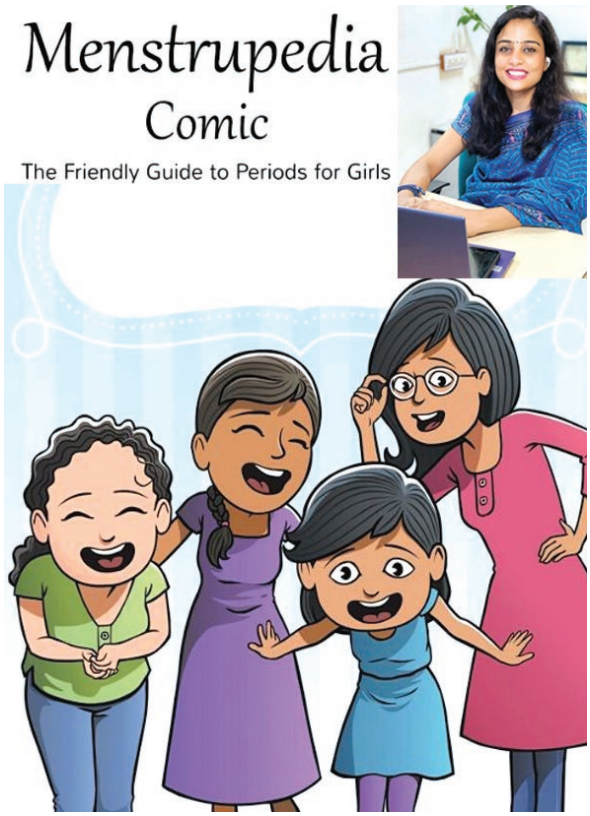

করেছে। তাদের তৈরি মেনস্ট্রুপিডিয়া এখন হুইসপার কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে 'টাচ দি পিকল' মুভমেন্ট চালাচ্ছে সারা ভারতে। বহু অভিনেত্রী যেমন শ্রদ্ধা কাপুর পরিনীতি চোপড়া, নেহা চুপিয়া, মন্দিরা বেদী, আরও অনেকে এই মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অদিতি পালের নাম লিস্টেড হলো 'ফোর্বস ইন্ডিয়া ফর্টি আন্ডার ফর্টি' ২০১৪। মেনস্ট্রুপিডিয়াকে এক লক্ষের বেশি ভিজিটর ভিজিট করে প্রতেক মাসে। তার কমিকসের বই বহু এনজিও যেমন প্রোৎসাহন, মুন্সী জগন্নাথ, কানহা এরা ব্যবহার করে সমাজে সচেনতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। লাদাখের বৌদ্ধরাও অদিতির এই কমিক বইয়ের ব্যবহার করছে।

গারহা, ঝাড়খন্ডের ছোটো একটি শহরের মেয়ে অদিতি আজ আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে দিকটা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। যা স্বাভাবিক, যা সাবলীল তা নিয়ে অযথা কিছু অবৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাস ছোটো ছোটো মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের এই চিরাচরিত ভুলের বিরুদ্ধেই আওয়াজ তুলেছেন অদিতি যা প্রকৃতি অর্থেই নারীর ক্ষমতায়নের দিকটিকে প্রদর্শিত করে। এর সঙ্গে যে দিকটি চোখে পড়ার মতো তা হলো অদিতি কিন্তু তার এই কাজের মাধ্যমে ব্যবসার জগতেও বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আজ বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে উইমেন এন্ট্রাপিনার্স হিসেবেও তার নামটা জ্বলজ্বল করছে। একইসঙ্গে সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক ও ব্যবসায়ী— সব তকমারই অধিকারিণী অদিতি। □

স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম ভেষজ

হলুদ

কৌশিক রায়

করোনা অতিমারীর বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতে যে ভেষজটির নাম সবারই কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে সেটি হলো হলুদ বা হরিদ্রা। কোভিড ভাইরাসের দৌরাত্ম্যে আমাদের দেহে তৈরি হওয়া বিষাক্ত 'সাইটোকাইন ঝড়'কে প্রতিরোধ করতে এবং রোগ প্রতিরোধক বা 'ইমিউনিটি বুস্টার' শ্বেত রক্তকণিকা কোষকে সুস্থ রাখতে হলুদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

হলুদের গুণাগুণ নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছেন অসমের গুয়াহাটিতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির জৈব বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক অজয়কুমার কুন্নুমাক্কারা। তিনি জানিয়েছেন, হলুদের মধ্যে প্রাপ্ত কারকুমিন নামক জৈব রাসায়নিকটি আমাদের কোষের 'শক্তিধর' মাইটোকনড্রিয়া এবং স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন, নিউরিলেমা ও অ্যাসিটাইলকোলিনকে মজবুত করে। এছাড়া, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু বা প্রোটোজোয়া-'প্লাসমোডিয়ান ফ্যালসিপেরাম' যক্ষ্মা রোগ ও স্তনের ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও যথেষ্ট কার্যকরী এই হলুদ। কারকুমিন ও জিংক অক্সাইড মিশ্রিত ওষুধ 'সিউডোমোনাস এরুগিনোসা' নামক জীবাণুর বিরুদ্ধেও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেয়। কানাডার ওন্টারিও শহরে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ডাঃ অমিত গর্গ জানিয়েছেন— হৃদরোগ ও কিডনির সমস্যার বিরুদ্ধেও ভালো ফল দেয় হলুদের এই কারকুমিন। ভারতীয়রা অবশ্য দিনে ৫০ গ্রাম করে কারকুমিন পেয়ে থাকেন। সেজন্যই পশ্চিমি দুনিয়ার তুলনায় ভারতে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কিতে অবস্থিত শ্রীরামস্বরূপ মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে হলুদের ওষধিগুণ নিয়ে ব্যপকভাবে গবেষণা শুরু হয়েছে। দেখা

গেছে মধুমেহ রোগ ঘটানো শর্করাযুক্ত লোহিত রক্তকণিকা অথবা গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন এবং বিভিন্ন চর্মরোগের প্রশমনে কারকুমিনের ভূমিকা আছে। চোখের গ্লুকোমা রোগ নিরাময় করতে কারকুমিন যুক্ত আই-ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

হলুদ আসলে উদ্ভিদের 'রাইজোম' (আদার মতো) জাতীয় অংশ। সম্ভবত আরব উপকূল ও পূর্ব আফ্রিকার টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মরক্কোর উপকূলবর্তী ত্রিপোলি, বেনগাজি, রাবাত, আগাদির ও কাসা ব্লাঙ্কা হয়ে সমুদ্র অভিযাত্রীদের হাত ধরে এই হলুদ ঢুকে পড়ে ভারতের রান্নাঘরে। হলুদ মিশ্রিত অন্ন (পিলে চাওল) ভারতের অনেক রাজ্যেই পারিবারিক মঙ্গলময়তা এবং অতিথি আপ্যায়নের দ্যোতক। গঙ্গামাতাকে ভক্তি নিবেদন করে হলুদরঞ্জিত চাদর দানের রীতিও আছে। তামিলনাড়ুর পোঙ্গল উৎসবে ভাতের হাঁড়ির সঙ্গে হলুদের শিকড় বাঁধার রেওয়াজ আছে। কেরলের ওনাম উৎসবে ভাপা মাছকে মুড়ে দেওয়ার জন্য হলুদের পাতা ব্যবহৃত হয়। অযোধ্যার নিরামিষ পোলাও বা জার্দাতে এবং রাজস্থানের বিভিন্ন পদে সুস্বাদু ও পুষ্টিবর্ধক হলুদের ব্যবহার হয়। প্রখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো একসময় হলুদকে 'দ্ররিদ্র ভারতবাসীর জাফরান' বা স্যাফ্রন হিসেবে সম্মান জানিয়েছিলেন। শুধু কোভিড অতিমারীর সময়েই নয়, দুধের সঙ্গে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে সারা বছর পান করলে শুকনো কাশি, সর্দি আর শ্বাসকষ্ট জনিত উপসর্গকে নিরাময় করতে অনেকটাই কার্যকরী। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর জানিয়েছেন বর্তমানে গোটা বিশ্বের মোট উৎপাদিত হলুদের ৭৮ শতাংশই ভারতে উৎপাদিত হয়। অতিমারীর সময়ে অন্যতম ভেষজ ফসল হিসেবে হলুদের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২৩ শতাংশের মতো, ১ কোটি ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৫০ টনের মতো। ◻

মহানিষ্ক্রমণের আগে ক্রিয়াযোগের দীক্ষা নেন সুভাষ

নিখিল চিত্রকর

১৯৩৯ সালের ১২ জুন। কলকাতার মোহিনী মোহন রোডের বাড়িতে এক যোগীরাজের জরুরি তলবে ছুটে এসেছেন সুভাষ। সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দাঁড়িয়ে এক চরম সন্ধিক্ষণে। সবেমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। গান্ধীজীর নির্দেশে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করছে। রাজনীতির ভবিষ্যৎ ও নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের ব্যস্ততা তখন চরমে। এমন সময়ে একদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদার কলকাতা বেড়াতে এলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করতে অতিশয় আগ্রহী তিনি। সমস্ত ব্যস্ততা, কাজ ফেলে সুভাষচন্দ্র সেদিন সকাল আটটার সময় বরদাবাবুর কাছে হাজির হন। সেদিন সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে বরদাচরণ একটি ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে ঢুকে বরদাচরণের নির্দেশ ছিল, তিনি ঘর না খোলা পর্যন্ত কেউ যেন দরজায় ধাক্কা না দেয়। শুরু হলো সুভাষচন্দ্র ও বরদাচরণের মধ্যে গভীর আলোচনা। চলেছিল টানা আড়াই ঘণ্টা। সবশেষে লাল-থমথমে চোখ-মুখ নিয়ে বাইরে এলেন সুভাষ। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রকে সেদিন তাঁর গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি একটিও বাক্যবিনিময় না করে নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে বসেন। গাড়িতে ওঠার আগে তাঁর পদক্ষেপও যেন স্বাভাবিক ছিল না। পরে জনৈক ভক্তের কৌতূহল নিরসন করতে গিয়ে বরদাচরণ বলেছিলেন, 'সব কথা বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি সেদিন সুভাষবাবুর অতীত জীবনের কিছু ঘটনার কথা তাঁকে বলেছিলাম। যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি জানতেন না, সুভাষবাবু প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেমন করে এই সব জানলেন!'

পরের দিন সন্ধ্যায়ও বরদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন সুভাষ। সেদিনই তিনি যোগীরাজের কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হন। বরদাচরণের কথায়, 'তাঁকে যোগের বিশেষ প্রক্রিয়া বলে দিলাম। ধ্যানে বসিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন।' এই আধ্যাত্মিক ধ্যানের জাগরণ সুভাষচন্দ্রকে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বনেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরের দিন অবশ্য আসার কথা ছিল না সুভাষের। কী কারণে তিনি এসেছিলেন এবং এতক্ষণ সময় কাটিয়ে গিয়েছেন তা নিয়ে খোলসা করেননি বরদাচরণও। 'পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদার ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের ক্রিয়া যোগী। কারও কাছে প্রথাগত দীক্ষা হয়নি বরদাচরণের। স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্করই ছিলেন তাঁর গুরু। মুর্শিদাবাদের লালগোলার মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্য একজন গৃহশিক্ষকের খোঁজ করছিলেন। তলব করা হলো বরদাচরণকে। তিনি তখন মুর্শিদাবাদের অওরঙ্গাবাদের নিমতিতায় একটি স্কুলের শিক্ষকতা

করছেন। স্বয়ং রাজা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন, না গিয়ে আর উপায় কী! সেই ডাকে সাড়ে দিয়ে লালগোলা চলে আসেন বরদাচরণ। কিছুদিন ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে পড়ানোর পরে তাঁকে লালগোলার এমএন অ্যাকাডেমিতে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে বলেন মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ। তখন থেকেই পাকাপাকি ভাবে তিনি থাকতে শুরু করেন লালগোলায়।

যোগীরাজ বরদাচরণের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ নিছক সাধারণ ঘটনা ছিল না। ছোটো থেকেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি প্রবল টান ছিল সুভাষের। স্বাধীনতার লড়াইয়ে যিনি নিজের জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করে দেবেন সেই সুভাষ হয়তো এমন একজন গুরুরই খোঁজ করছিলেন যিনি তাঁকে সঠিক পথ দেখাবেন।

যোগীরাজের সঙ্গে সুভাষের সাক্ষাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আজও অজানা। তবে সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিষ্ক্রমণের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল এখান থেকেই। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের দেখা হয়েছিল যোগীরাজের সঙ্গে। আর তার পরেই ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি সুভাষের অন্তর্ধানের খবর প্রকাশিত হয়। হয়তো সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' হয়ে ওঠার স্ফুলিঙ্গ নিহিত ছিল সেই আধ্যাত্মিক সাক্ষাতেই। ■

নেতাজীর বিবাহের গল্প একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

শ্যামল পাল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতমায়ের বীর সন্তান তথা পরবর্তী প্রজন্মের এক মহান আদর্শ। তিনি ভারতমায়ের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা অত্যাচারী ইংরেজদের হাত থেকে ভারতমায়ের শৃঙ্খল মোচনে তার অবদান অতুলনীয়। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের শেষ জীবন সকলের কাছে একেবারে অজানা থেকে গেল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্ত করে দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষে যে করুণ পরিস্থিতির মোকাবিলা সাধারণ মানুষ করেছে, তা হয়তো করতে হতো না যদি নেতাজীর মতো এক মহান ব্যক্তিত্বের হাতে দেশের ভার থাকতো। হয়তো দেশ বিভাগের চক্রান্তও তিনি ব্যর্থ করে দিতে পারতেন। নেতাজীর শেষজীবন নিয়ে যেমন সকলের মধ্যে এক অস্পষ্টতা থেকে গেছে, ঠিক একই রকম নেতাজীর বিবাহ নিয়ে নতুন চক্রান্ত সমাজের সামনে উঠে আসে। নেতাজীর মতো একজন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি সারা জীবন ব্রহ্মচারীর মতো সবকিছু ত্যাগ করে দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, যিনি ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য ভারতীয় জনসমাজ তথা বিশ্বের ভারত প্রেমীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন, যিনি নিজের পরিবারের জন্য বিন্দুমাত্র সময় অতিবাহিত করতে পারেননি, তার সম্বন্ধে হঠাৎ করে স্বাধীনতার দুদিন আগে এই ধরনের গোপন চক্রান্তের উদ্ভব ঘটে। নিঃসন্দেহে এটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বলা হয় ১৯৩৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার বিখ্যাত বই 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' লিখতে শুরু করেন। তার ব্যস্ত জীবনে বইটি লেখার সময় একজন স্টেনোগ্রাফারের প্রয়োজন ছিল। সেসময় একজন স্টেনোগ্রাফারের সিলেকশনের জন্য একটি ইন্টারভিউ-র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন, তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের এক পরিচিত ডক্টর মাথুরের সুপারিশে এমিলি শেঙ্কল নামে ২৩ বছরের এক যুবতীকে স্টেনোগ্রাফার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই থেকে নেতাজীর সঙ্গে এমিলি শেঙ্কল-এর পরিচয়। এই পরিচয় নাকি ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে এবং দুজনের মধ্যে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি হয়। অবশেষে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা নাকি গোপনে হিন্দু মতে বিবাহ করেন, কারণ সেসময় জার্মানিতে কেউ বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করতে পারত না। তারপর নাকি ১৯৪২ সালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, যার নাম রাখা হয় অ্যানিটা। এরপরে সুভাষচন্দ্র নাকি তাদের জার্মানিতে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চলে যান।

ভারতবর্ষে এই গল্পের প্রথম উদ্‌গাতা জওহরলাল নেহরু। ভিয়েনায় বসবাসকারী একজন ভারতীয় কেমিস্ট ডাক্তার আবদুল হাফিজ আকমত নাকি ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহরুকে জানান সুভাষচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন এবং তার স্ত্রী ও এক কন্যা ভিয়েনায় রয়েছেন। নেহরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এবং তারা নাথালাল পারেখ নামে একজনকে এবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ভিয়েনাতে পাঠান। তারপরে নেহরু শরৎচন্দ্র বসুকে পুরো বিষয়টা চিঠির মাধ্যমে জানান, যেখানে ড. আকমতের লেখা নোটের উল্লেখ থাকে। শরৎচন্দ্র বসু সেই চিঠি পেয়ে প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি যে সুভাষের মতো একজন দেশপ্রাণ মানুষ যিনি ভারতমায়ের জন্য সর্বদা নিবেদিত তিনি এই ধরনের কাজ করতে পারেন! রেগে গিয়ে তিনি সরদার বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠিতে লেখেন, 'I cannot accept the report contained therein as true. I wish you had referred the matter to me before writing to Nathalal. I do not think Nathalal has the training necessary to make enquiries of this nature and he may do more harm than good. After if Subhas left a family (which I do not believe) it is up to me and not to Nathalal to assist the farmily'।

সুভাষচন্দ্রের কাছের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এশিয়ান নাম্বিয়ারকে নেহরু এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে বলেন। নাম্বিয়ার ১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট একটি লম্বা চিঠি লিখে পাঠান সেখানে তার বিবাহ সংক্রান্ত কথা ছিল। তিনি লেখেন নেতাজী নাকি নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। নেতাজীর বিবাহ সংক্রান্ত খবর স্বাধীনতার

আগেই ১১ ও ১৩ আগস্ট শরৎচন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেছিল। নাথালাল পারেক তিন সপ্তাহ ধরে এমিলি শেঙ্কলের থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এমিলি শেঙ্কল নিজের হাতে লেখা চিঠি নাথালাল পারেকের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বসুকে পাঠান। এমিলি শরৎচন্দ্র বসুকে পরপর তিনবার চিঠি লেখা সত্ত্বেও একটি চিঠিও শরৎচন্দ্র বসুর কাছে পৌঁছায়নি। ২০১৫ সালে কলকাতা পুলিশের ফাইলগুলি ডিক্লাসিফাই হওয়ার পরে দেখা গেল সে চিঠিগুলি সেখানে রয়েছে। শরৎচন্দ্র বসুর কাছে পাঠানো হয়নি, কিন্তু কেন? নেহরুর প্রচেষ্টায় এভাবে সকলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শচরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৮ সালে ১০ এপ্রিল এমিলিকে চিঠি লেখেন। এভাবে তাদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয় এবং অবশেষে শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ভিয়েনা পৌঁছান। সেখানে নেতাজীর নিজের হাতে লেখা কিছু তথ্য এমিলি শেঙ্কল শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দেয়। তবে ১৯৪৭ সালে সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্র অরবিন্দ বসু এমিলির সঙ্গে দেখা করে আসেন এবং কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র বসু প্রায় এক বছর পরে জানতে পারেন, বসু পরিবারের একজন এমিলির সঙ্গে দেখা করে এসেছে সেটা একেবারে অজানা থেকে গেল, সেখানেও একটি সন্দেহের দানা বাঁধে। আবার ভারতবাসীর সামনে তার বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রথম প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯৫১ সালে মে মাসে। কিন্তু কেন? শরৎচন্দ্র বসু বেঁচে থাকাকালীন কেন এই খবর জনগণের সামনে আনা হলো না?

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের মতোই রহস্যাবৃত তার বিয়ের কাহিনি। কেউ বলেন তিনি এমিলি শেঙ্কলকে বিয়ে করেছিলেন, কেউ বলেন বিয়ের গল্পটা ষড়যন্ত্র, কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন না করেননি তা নিয়ে বিতর্ক অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু না চাইলেও বিতর্ক চলে আসে। অনেক ক্ষেত্রে তা এক অত্যন্ত কুৎসিত রূপ নেয়, তাতে যেমন সুভাষচন্দ্রের মর্যাদাহানি হয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব সঠিকভাবে ও পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই এই বিতর্কের অবসান হওয়া প্রয়োজন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে বসু পরিবারের মধ্যেই বহু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ২০১৬ সালে মাধবী বসুর লেখা 'The Bose Brothers and Indian Independence' বইতে মাধবী বসু উপরের লেখা চিঠিটির উল্লেখ করলেও শরৎচন্দ্র বসু যে একেবারে তা মানতে নারাজ ছিলেন সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেননি। এছাড়াও বিয়ের তারিখ নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। পারেকের মতে ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে নেতাজীর বিয়ে হয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'দ্য স্প্রিং টাইগার' নামক বইয়ে সুভাষচন্দ্রের কথা আলোচনা থাকলেও তারিখ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা ছিল না। ১৯৭২ সালের কৃষ্ণা বসুর লেখা 'ইতিহাসের সন্ধানে' নামক বইটিতেও বিয়ের তারিখ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে কৃষ্ণা বসুর লেখা একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় নেতাজী ১৯৪১ সালে বিবাহ করেন। শিশির বসু কলকাতায় মামলা চলাকালীন এক এফিডেভিটে নেতাজীর বিবাহ ১৯৪২ সালে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই মামলার যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন জার্মান আইন মতে এই বিবাহ বৈধ ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সরদার বল্লভভাই প্যাটেলকে লেখা এমিলির চিঠিতে বলেন, 'According to Law I'm not married to be Mr. Subhas Chandra Bose'। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত এমিলিকে লেখা সুভাষের পত্রসংকলনে নেতাজী ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাসের বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১১ সালে সুগত বসুর 'His majesty's Opponent' রচনাটিতেও একই তারিখ উল্লেখ করা হয়। এরকম বসু পরিবারের এক একজনের এক এক রকম মন্তব্য তাদের বিবাহের বৈধতার উপর প্রশ্ন চিহ্ন এনে দেয়।

এমিলি নিজেও নিজের বিবাহের তারিখ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম চিঠিতে এমিলি লেখেন যে তাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে। ভিয়েনাতে কে বি রামাস্বামীকে এমিলি বলেন সুভাষ নাকি তাকে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রপোজ করে এবং তাদের বিয়ে হয়। তারিখ আবার বদলে যায়। যখন ১৯৭১ সালে নেহরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরির ডিটেক্টর বি আর নন্দাকে জানান ১৯৩৭ সালে তাদের বিয়ে হয়। Leonard A. Gordon-এর লেখা 'Brothers against the Raj' গ্রন্থে নেতাজী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই বইতে বলা হয় গর্ডনের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে এমিলি বলেছিলেন যে তাদের বিয়ে ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে হয়েছিল। এইভাবে কী করে একজন নিজের বিয়ের তারিখ ভুলে যায়। এখানেও কি একটি সন্দেহ থেকে যায় না? গর্ডন আরও উল্লেখ করেন যে জার্মানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এমিলিকে দেখতে পারতেন না। তারা

কখনোই বিশ্বাস করতেন না যে এদের মধ্যে এধরনের কোনো সম্পর্ক ছিল। জার্মান ফরেন অফিসার আলেকজান্ডার ওয়াগ একটি আনপাবলিশ ম্যানুস্ক্রিপ্টে বলেন নেতাজী ও এমিলির মধ্যে কোনো বিবাহবন্ধন হয়নি। ১৯৪৮ সালে বারাণসী থেকে প্রকাশিত 'সন্মার্গ' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নেতাজী সুভাষ নাকি এক জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেন। তারপরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একই ধরনের খবর ছাপানো হয়। সেসময় ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেতা রামগতি গাঙ্গুলী শরৎচন্দ্র বসুকে জিজ্ঞেস করেন এই ঘটনার সত্যতা আছে কিনা? তখন শরৎচন্দ্র বসু উত্তরে দু'লাইনের চিঠিতে বলেন 'এসব বাজে কথায় গুজবে কান দেবেন না'।

এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীরদ সি চৌধুরী বলেন, 'নেতাজীর মতো একজন ব্রহ্মচারী দেশনেতা একজন সাধারণ স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করবে এ কখনই মেনে নেওয়া যায় না'। সুভাষচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ১৯৯৬ সালে 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তিনি বলেন, 'সুভাষচন্দ্র নারীর প্রেমে ব্রত ত্যাগ করিতে পারেন না, এই ধারণা তাহার বন্ধুদের মধ্যে কীরূপ দৃঢ় ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য একটা কাহিনি বলি। তাহার ও আমার একজন সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাদের মধ্যে এরূপ আলাপ একদিন হইল। তিনি বললেন ও পাগলটাকে সারাবার একটাই মাত্র উপায় আছে। যদি কলকাতার কোনো প্রগলভা রূপসী ওকে একটা ঘরে নিয়ে বলাৎকার করে, তাহলে সে ধর্মবোধ থেকে তাকে বিয়ে করবে। তখন পাগলামি সেরে যাবে। অবশ্য এ রোগ চিকিৎসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবে আমি জানিতাম অনেক বাঙ্গালি রূপসী তাহাকে পতিরূপে পাইলে নিজেদের ধন্যা মনে করিতেন। তিনি তাদের সংস্পর্শে আসিতেন বটে তবে কোনো দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাহার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তাহারাও অভিমানিনী হইতো না। সুভাষচন্দ্র জীবনে জার্মানিতে গতানুগতিক হইলেন আমার কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক'। অর্থাৎ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখার মাধ্যমে স্পষ্ট উঠে আসে যে নেতাজী এ ধরনের কাজ করতে পারেন না। পিডি সাগ্নি সম্পাদিত বইতে নাথালাল পারেক লেখেন, 'The news of Subhas's marriage in Germany came quite as a surprise to everyone in India. During his later school days. Subhash had come in contact with the writings and speeches of Swami Vivekananda and as a consequence thereof, had decided to live the life of a Brahmachari and to devote himself to the uplift of the Indian masses. অর্থাৎ এ ধরনের একজন ব্যক্তি যিনি ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করবেন এবং দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে সমর্পণ করবেন বলে সংকল্প নিয়েছেন, তিনি এই ধরনের কাজ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় কি?

জিডি খোসলা তার লেখা 'Last Days of Netaji' বইতে তিনি এমিলি ও অনিতাকে সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে উল্লেখ করেন, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু জিডি খোসলার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলায় তাঁর বক্তব্য ছিল নেতাজী ছিলেন চির ব্রহ্মচারী তিনি কোনোদিন বিবাহ করতে পারেন না। ফলে জিডি খোসলা ও তার প্রকাশক ক্ষমা চেয়ে এই কথাগুলি বই থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আর এক রাজনৈতিক সহকর্মী হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার জীবনী লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন নেতাজী যখন ১৯৩৭ সালে করাচি বিমানবন্দরে উপস্থিত হন তখন তাকে তার বিবাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলেন ওসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় আমার নেই। কিন্তু আমরা দেখলাম এমিলি ও বসু পরিবারের কয়েকজন বলেন যে ১৯৩৭ সালে নাকি তিনি জার্মানিতে বিবাহ করেছেন। এটা কীভাবে সম্ভব? তাহলে কি নেতাজী মিথ্যা কথা বলেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পরিবর্তে পালটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে কেন তিনি মিথ্যে কথা বলবেন? তিনি কোনও পদের আশায় ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি যে বিবাহের সত্যতা স্বীকার করলে তাঁর পদপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা লাভের গন্ধ আগাম পেয়ে কংগ্রেসের কিছু স্বার্থান্বেষী নেতাই যে নেতাজীর চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে তাঁর বিবাহের গল্প ফেঁদেছেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ▯

স্বরাজ সাধনার মহারথী

কল্যাণ চক্রবর্তী

ভারতবাসীর কাছে স্বরাজ সাধনার ধারাকে বাস্তবতার পথে প্রবাহিত করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র ও অরবিন্দের চেতনায় স্বরাজ্যের ভিন্নতর ধারাকে সমন্বয় করে যে বাস্তবের মাটিতে নামলো স্বরাজ্য ভাবনা, তার মহারথী সুভাষ। বঙ্কিম-মানসে ছিল অখণ্ড-জাতির ভাবনা আর অসুর বিনাশের যজ্ঞ; ,সাহিত্য-স্বরাজ। স্বামী বিবেকানন্দে প্রতিভাত হলো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বরাজ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ধারার মধ্যে মুক্তি পেল ভারতবর্ষের অখণ্ড চেতনার রূপ-রস-গন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সুরে ভারতবীণায় বেঁধে দিলেন রাজনৈতিক স্বরাজবোধ। এই সকল পথের অমোচ্য সংগীতে শুরু হলো স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যুদ্ধ; সুভাষ তার মহাধিনায়ক। বিশ্বের সকল ঘটনাকে বাস্তবতার লাশকাটা ঘরে কাটাছেড়া করে, তিনি শত্রু-মিত্র জটিলতাকে সহজ সরল রূপ দিলেন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যার অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশবিরোধী শক্তি তাঁকে নানান গালমন্দে ভূষিত করল; খসে পড়ল নানান ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক মুখোশ। কিন্তু নেতাজী অনন্য। আত্মত্যাগ ছাড়া যে রাজনীতির লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা তিনি ভারতবাসীকে এবং ভারতের রাজনীতিবেত্তাদের বুঝিয়ে দিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই; পরগাছা থেকে মুক্তি নেই ভারতবর্ষের। নেতাজীর জন্ম দিবসে তাঁর কর্মজীবন, মতাদর্শ ও দার্শনিকতার প্রজ্ঞা প্রবাহ আমাদের মধ্যে গভীর খাতে প্রবাহিত হোক, ভারতমাতার কাছে এই প্রার্থনা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বেণীমাধব দাসের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র নেতাজী হয়েছেন

রাজদীপ মিশ্র

একজন মানুষের মহামানব হয়ে ওঠার পেছনে অনেকের অবদান থাকে। অবদান থাকে তার বাবা-মা-পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদেরও অবদান অনেক ক্ষেত্রে অসামান্য হয়ে ওঠে।

পরিবারের বাইরের যে সকল ব্যক্তির অবদানের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু 'নেতাজী' হয়েছিলেন; একজন সৎ, নির্ভীক, আপোশহীন দেশপ্রেমিক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৮৬ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলায় বেণীমাধব দাসের জন্ম। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ বাঙ্গালি পণ্ডিত, শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক। অসংখ্য ছাত্র তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ।

দর্শনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর বেণীমাধব দাস চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ঢাকা, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল এবং কলকাতার স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। দেশপ্রেমে ও শিক্ষকতায় নিবেদিতপ্রাণ বেণীমাধব দাস ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক।

ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। তাঁর পরিবার ছিল রাজনৈতিক পরিবার। অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনে যোগ

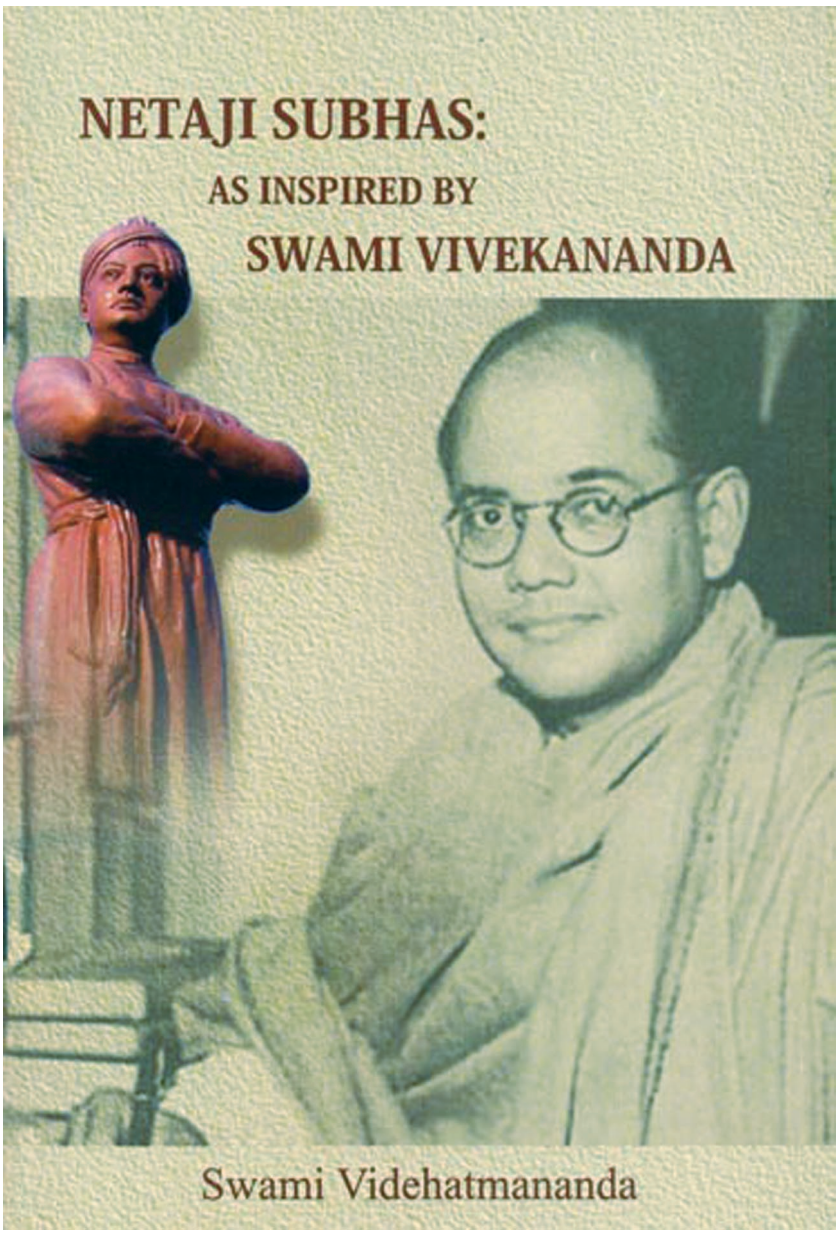

দেওয়ার কারণে তাঁর মেজ ছেলে কারাবরণ করেন। তাঁর দুই কন্যা— কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) ও বীণা দাস (ভৌমিক)। কল্যাণী দাস বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য কারাবরণ করেন। বীণা দাস ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাঙ্গলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ন' বছর কারাবাস করেন। ছেলে-মেয়েদের বিপ্লবী কাজকর্মে বাধা দান তো দূরের কথা, বেণীমাধব রীতিমতো উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁর পরিবারে, তাঁর ছেলে-মেয়েদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রীকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন— এটাই তো স্বাভাবিক। আর বাস্তবে হয়েও ছিল তাই।

১৯০৯ সালে কটকের কাঠাজুড়ি নদীর তীরে বাংলা মাধ্যমে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন সুভাষচন্দ্র। বেণীমাধব দাস তখন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশচেতনা ছোট্ট সুভাষকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এই সৎ, নীতিনিষ্ঠ, ঋষিতুল্য শিক্ষক সুভাষের মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। সুভাষের মনে শিক্ষক বেণীমাধব দাসের একটি স্থায়ী আসন ছিল। সুভাষের ভেতরে যে আগুন আছে তা ওই শিক্ষকের চোখ ঠিক ধরতে পেরেছিল। পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে বেণীমাধববাবুর নানা আলোচনা সুভাষের মনকে উদ্দীপ্ত করত। বেণীমাধববাবুই সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে, কৈশোরের অস্থির সময়ে যা সুভাষকে লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় এই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষক বেণীমাধব দাস ছাত্রদের অকুণ্ঠ উৎসাহ দিতেন নানা বিষয়ে বই পড়তে। পরে তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সক্রিয়ভাবে সমাজসেবায় অংশ নিতেও উৎসাহ দিতেন।

১৯১১ সালের ১১ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী ক্ষুদিরাম বসুর তৃতীয় শহিদ দিবস পালনের জন্য কটকের ঘরে ঘরে অরন্ধন ও অনশন হয়। সুভাষের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি দল ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা। আর একাজে প্রধান শিক্ষক বেণীমাধববাবুর সম্মতি ছিল। এই খবর ব্রিটিশ সরকার পেয়ে যায়। তার ফলে বেণীমাধব দাসকে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কটক থেকে কৃষ্ণনগরে বদলি করা হয়। ছাত্র সুভাষ এতে মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বেণীমাধব দাস অনেক দূরে চলে গেলেও সুভাষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। বরং চিঠিপত্রে দুজনের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল। যেসব কথা তাঁরা সামনাসামনি একে অপরকে বলতে পারেননি, চিঠিতে সহজেই প্রকাশ করতে পারতেন সেগুলো। প্রিয় শিক্ষককে তার মনের কথা জানাতেন সুভাষ। আর বেণীমাধববাবুও নতুন নতুন চিন্তাভাবনার জোগান দিতে লাগলেন কিশোর সুভাষের চিন্তা-চেতনায়। এই সময় কৃষ্ণনগর থেকে সুভাষকে লেখা বেণীমাধববাবুর পত্র নিয়ে স্বাস্থোদ্ধারের জন্য কটক আসেন হেমন্ত কুমার সরকার নামে এক তরুণ। কিশোর সুভাষ যে মনে প্রাণে অস্থির হয়ে পথনির্দেশ খুঁজছে তা বুঝতে পেরেই বেণীমাধববাবু তরুণ হেমন্তকে কিশোর সুভাষের কাছে পাঠান। এই হেমন্ত সরকার কিশোর সুভাষকে রাজনৈতিকভাবে কলকাতায় বিপ্লবী দলের বিষয়ে এমন সব তথ্য দেন যা সুভাষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। প্রবল দেশপ্রেম কিশোর সুভাষকে স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জাগরণ ও দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এসেও সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন— 'ভারত পথিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর কথা। এমনকী দেশত্যাগের আগে তিনি তাঁর কাছে আশীর্বাদও চেয়েছেন।

কটক ও কৃষ্ণনগরে বেণীমাধবের সংস্পর্শে আসা আরেকজন পণ্ডিত, নিরঞ্জন নিয়োগী বেণীমাধব দাসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, '...here was no harshness in his administation, no pampous displag surronding it–his cool and charming behaviour used to have a remarkable impact on his students. Even those who was turbulent calmed down, became respectful towards him and were endeared to his affections.' (...এখানে তার প্রশাসনে কোনো কঠোরতা ছিল না, এর চারপাশে কোনো আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন ছিল না— তাঁর কোমল ও মনোমুগ্ধকর আচরণ তাঁর শিক্ষার্থীদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলত। এমনকী যারা অস্থির ছিল তাঁরা শান্ত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং তাঁর স্নেহের পাত্রে পরিণত হয়।'

তখন এলিট বাঙ্গালি সমাজে ইংরেজদের অধীনে উঁচু পদের চাকরিকেই সম্মানজনক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। সুভাষচন্দ্রের মামা বিনোদচন্দ্র মিত্র ছিলেন বাঙ্গলার অ্যাটর্নি জেনারেল। ছোট্ট সুভাষ স্বপ্ন দেখতেন, বড়ো হয়ে মামার মতো পদাধিকারী হবেন অথবা আইসিএস হবেন। র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস সুভাষের চিন্তা ভাবনা পালটে দিলেন। তাঁকে সংস্পর্শে এসেই ইংরেজ সরকারের আজ্ঞাবাহক কোটপ্যান্ট পরিহিত নকলনবিশ কর্মচারীদের প্রতি সুভাষের যে অন্ধভক্তি এতদিন ছিল তা এক ঝটকায় উবে গেল। যদিও ছোটোবেলা থেকেই সুভাষ কোটপ্যান্ট পরে স্কুলে যেতেন, বেণীমাধবের অনুসরণে সুভাষ ধুতি ও জামা পরে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলেন। এই বিষয়ে আরেক ব্যক্তিরও প্রভাব ছিল, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'গৈরিক বস্ত্র পরে স্বামী বিবেকানন্দ যদি বিশ্বে এত খ্যাতি পেতে পারেন, তবে আমি কেন কোটপ্যান্ট পরব?' —বাল্যকালে সুভাষ তার বাবাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বারোর কিছু বেশি হবে। এর আগে কাউকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেছি বলে মনে পড়ে না। বেণীমাধব দাসকে দেখবার পর শ্রদ্ধা কাকে বলে মনেপ্রাণে অনুভব করলাম। কেন যে তাঁকে দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগতো তা বোঝবার মতো বয়স তখনো আমার হয়নি। শুধু বুঝতে পারতাম, তিনি সাধারণ শিক্ষকের পর্যায়ে পড়েন না। মনে মনে ভাবতাম, মানুষের মতো মানুষ হতে হলে তাঁর আদর্শেই নিজেকে গড়তে হবে।' বাস্তবে হয়েও ছিল তাই।

সুভাষ যে মানুষের মতো মানুষ হয়েছিলেন তার পেছনে আরেক ব্যক্তির অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুভাষ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন— 'Vivekananda entered my life. ত্যাগ বেহিসাবি, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর, তেমনি বহুমুখী। ...আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বিরল। স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ... ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছুই বলা হবে না, তিনি এমনই ছিলেন মহৎ এমনই ছিল তাঁর চরিত্র। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।' সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজীর জীবনে কতখানি জায়গা অধিকার করেছিল সেটা নেতাজীর কথা থেকেই জানা যায়। নেতাজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সুভাষের সঙ্গে আবাল্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তাই জোর করে বলতে পারি, বিবেকানন্দের প্রভাব যদি সুভাষের ওপর না পড়ত, তাহলে সুভাষ 'সুভাষ' হতো না, 'নেতাজী' হতো না। হয়তো অ্যাডভোকেট জেনারেল হতো কিংবা ব্যারিস্টার হতো, কিন্তু আইএনএ যে ফর্ম করেছে সেই 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'কে আমরা পেতাম না।

ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষ নিজের অজ্ঞাতেই সন্ধান করছিলেন এমন একটা মূল নীতি, যাকে অবলম্বন করে তার জীবন গড়ে উঠতে পারে। এই নীতি বা আদর্শকে খুঁজে নেওয়া সহজ কাজ ছিল না। একদিন নেহাত দৈবক্রমে এমন কিছুর সন্ধান তিনি পেলেন যা তাঁর সেই মানসিক সংকটকে দূর করতে প্রধান সহায় হলো। তাঁর কথায় : 'আমার এক আত্মীয় পাশের বাড়িতেই থাকিতেন। তিনি এই শহরে নতুন আসিয়াছিলেন। আর আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে হইত। তাঁহার বইগুলির ওপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে নজরে পড়িল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। করয়েকটি পৃষ্ঠা উলটাইয়াই বুঝিলাম যে, উহাতে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। বইগুলি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া বাড়িতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক মঞ্চে নেতাজী

আনিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিলাম। মজ্জাবধি আমার শিহরিয়া উঠিল, এমন এক আদর্শের সন্ধান পাইলাম যাহার জন্য আমার সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করিতে পারি।' অন্য এক স্থানে সুভাষচন্দ্র লিখছেন— 'বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময় জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরোও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।'

স্কুলজীবন যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল সুভাষের আধ্যাত্মিক স্পৃহাও ততই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও স্বামীজীর বাণী ও রচনা তার সহায়ক হলো। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানব কল্যাণ--- এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। তিনি ঠিক করলেন, জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য দর্শন পড়বেন এবং বাস্তব জীবনে যথাসম্ভব স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করবেন।

১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি একটি বন্ধুর সঙ্গে গোপনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণে তিনি বহু ধার্মিক লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কাশীতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে গেলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর পরিবারকে ভালোভাবে জানতেন। সন্ন্যাস জীবন নয়, অন্তরের বৈরাগ্য থেকে দেশের কাজে তাঁকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে--- এই ছিল সুভাষের প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ।

১৯০১ সালে ঢাকায় একদল যুবককে স্বামীজী বলেছিলেন— 'দেশসেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে সর্বাগ্রে।' যুবক সুভাষচন্দ্র একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর আদর্শে প্রভাবিত সুভাষ বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারকে লেখেন— 'আমি দিন দিন এটা বেশ বুঝিতেছি যে, আমার জীবনের একটা definite mission আছে এবং তার জন্যই আমার শরীর ধারণ।'

স্বামীজীর আহ্বানকে সুভাষ মন্ত্ররূপে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেশোদ্ধারের কাজে সমর্পণ করেছিলেন। দাসত্ব, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানিয়ে সুভাষ বললেন--- 'ভুলো না, মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভুলো না, জঘন্যতম অপরাধ হলো অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোশ করা। মনে রেখো, শাশ্বত সেই বিধান : জীবন যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্য যতই মূল্য দিতে হোক।' ■

ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের

মন্দ্রিকা গোস্বামী

১৯৩৮ সাল। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসু মহারাষ্ট্রের নাগপুর পরিদর্শনে গিয়েছেন। হঠাৎ ট্রেনের কামরা থেকে দেখলেন

খাকি পোশাকধারী সুশৃঙ্খল একদল যুবক রাস্তা দিয়ে বাদ্য সহযোগে মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। উৎসাহী সুভাষচন্দ্র পাশে বসা স্থানীয় কংগ্রেস কার্যকর্তার কাছে জানতে পারলেন যে সুশৃঙ্খল যুবকরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র আরও জানতে পারলেন যে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পূর্ব পরিচিত বিপ্লবী ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ আজন্ম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতো আবেদন নিবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মারের বদলে মার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এর জন্যে দরকার ছিল দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদিত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি পরিণত সুশৃঙ্খল বাহিনী, যারা ধূর্ত ও শক্তিমান ইংরেজদের কাছ থেকে শক্তির ভাষাতেই স্বাধীনতা বুঝে নেবে। আরএসএস-এর মধ্যে তিনি এমন রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের আগেই সুভাষচন্দ্র হাতে-কলমে এমন বাহিনী নির্মাণ করেছিলেন। বেশ কিছু বিপ্লবী সংগঠন বিশেষ করে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সঙ্ঘের' সঙ্গে টববগে কংগ্রেস কর্মীদের একত্রিত করে তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার্স, সংক্ষেপে বিভি। যাদের বিপ্লবী নায়ক মেজর সত্য গুপ্তের নেতৃত্বে কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বাহিনীর জিওসি অর্থাৎ জেনারেল অফিসার অব কমান্ডিং। এমনকী মহিলা ব্রিগেডও তৈরি হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল লতিকা বসু। ১৯২৫ সালে ডাক্তারজী প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, অনুশাসন বদ্ধ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। এক অধিবেশনে ডাক্তারজী যখন নেতাজীকে জানালেন যে তিনিও এমন একটি সংগঠন স্থাপন করেছেন, তখন নেতাজী বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'জাতীয় পুনর্নির্মাণে এর ধরনের সংগঠনই কেবল কাজের হতে পারে'। যাইহোক বিভি বাহিনীর নিয়মিত কুচকাওয়াজ, সুশৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মোতিলাল নেহরুকে যেভাবে সামরিক কায়দায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তা সর্বস্থানে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বিভি-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন বাহিনীতো চাই আজকের দিনে। সুভাষ দেখালেন বটে! শুধু গান্ধীজী তা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি অহিংসার ঘোরতর পূজারি তার কংগ্রেসে কিনা এমন যুদ্ধ যুদ্ধ আয়োজন! কংগ্রেসে সুভাষ বাহিনীর এ কেমন ঘোরতর উৎপাত! তিনি প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ করে বললেন, 'এ হলো পার্ক সার্কাসের সার্কাস'! শুরু হলো ক্রমাগত আক্রমণ। সুভাষচন্দ্র সাময়িক ভাবে পিছিয়ে এলেন। এবারের ক্ষেত্রেও তাই হলো, তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে বাধা দেয়, ফলে সাক্ষাৎ অধরা থেকে যায়। সম্ভবত তৎকালীন অস্থির বিশ্বে জর্জরিত ব্রিটিশ শক্তি উৎপাটনে শৃঙ্খলাবদ্ধ আরএসএস-কে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এমন চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এরপর ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলে, মুক্ত সুভাষ পুনরায় ডাক্তারজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর মতামত জানতে চান। এরপরেও নেতাজীর সঙ্গে ডাক্তারজীর সাক্ষাতের মহাসন্ধিক্ষণ এসেছিল ২০ জুন ১৯৪০। নেতাজী তাঁরই সৃষ্ট সংগঠন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা রামভাউ রুইকরকে সঙ্গে নিয়ে কোনো পরামর্শের জন্যে নাগপুরে আসেন। ডাক্তারজী তখন মৃত্যু শয্যায়। ১০৩°-১০৪° জ্বর। নিদ্রাহীন কয়েক রাতের পর সবে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন। সব জেনে নেতাজী ডাক্তারজীকে জাগাতে নিষেধ করলেন। দূর থেকে নমস্কার জানিয়ে তিনি চলে যান। ডাক্তারজী যখন জানতে পারলেন তখন অস্ফুটে কয়েকবার 'সুভাষ' উচ্চারণ করেন। পরদিনই ২১ জুন ডাক্তারজী ইহলোক ত্যাগ করেন। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর সুভাষও ভারত ত্যাগ করে জার্মানি হয়ে জাপানে এসে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ পরবর্তীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিলেন। হলেন সকলের প্রিয় নেতাজী। আজন্ম লালিত সশস্ত্র, সুশৃঙ্খল বাহিনীর স্বপ্ন সার্থক হলো। ব্রিটিশ সিংহের হৃদয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ■

বাঙ্গলার আলপনার চিহ্ন-সংকেত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বাঙ্গলার আলপনা দ্বিবিধ— নান্দনিক ও কামনাত্মক। নান্দনিক আলপনা আঁকা হয় আনুষ্ঠানিক কাজে সৌন্দর্যের প্রায়োজনে; যেমন, বিবাহ, উৎসব, সমাবর্তন-সহ নানান সামাজিক-পারিবারিক উৎসবের প্রেক্ষিতে। কামনাত্মক আলপনা আঁকা হয় ব্রতানুষ্ঠানে, যেখানে পার্থিব কামনা-বাসনাই প্রাধান্য পায়। উভয় ক্ষেত্রেই নান্দনিকতা ও কামনার প্রকাশে ব্যবহৃত হয় কিছু 'মোটিফ'। এই মোটিফ প্রকাশের যা চিত্র তাকেই এখানে চিহ্ন-সংকেত বা প্রতীক বলা হবে। যেমন আলপনায় কয়েকটি বিশেষ অঙ্কনরীতি হলো পদ্ম, ধান, সাপ, পেঁচা-সহ নানান পাখি, লতামণ্ডপ, কলা, গুয়া, সুপারি, কড়ি, মাছ, ময়ূর, প্রজাপতি, হাঁস, মৌচাক, নৌকো, সূর্য, চন্দ্র, তারা, গোলাঘর, গোরু-বাছুর ইত্যাদি। এই প্রতীকচিহ্নগুলির কোনোটি পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্যোতক; কোনোটি ফসলরূপে আহার্য, কোনোটি বাঙ্গলার চিরায়ত জৈববৈচিত্র্যের অপরিহার্য অঙ্গ, কোনোটিতে বাঙ্গলার আদিম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

আলপনার প্রচলিত বহু চিহ্নের সংকেত অধুনা বিলুপ্ত হয়েছে। এসেছে নব-পরিবেশানুগ নবতর তাৎপর্য'। এই বিলোপ ও নবায়নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আলো-আঁধারির ইতিহাস। প্রকৃত আলোয় আমরা আধুনিকতার মধ্যে আদিমতাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবো। আলপনায় ব্যবহৃত চিহ্ন সংকেত অবিকল তার বাস্তবের প্রতিরূপ নয়। মানে সাপের হুবহু আদলের বদলে সর্পিল রেখা আঁকা হয়; পদ্মের প্রকৃত ছবির বদলে তার সাংকেতিক ছবি উপস্থাপন করা হয়; এক-দুটি রেখায় ফুটে ওঠে পেঁচার অবয়ব; দু'একটি টানেই মাছ আঁকা হয়ে যায়। কিন্তু কেন? শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লিখেছেন, তার কারণ শিল্পসৌন্দর্যে লোকসমাজের সীমাহীন অতৃপ্তি। অধ্যাপক মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই লেখকের মতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদি ও সরলরূপ দর্শনই এর কারণ। এবং এই দেখা লোকসংস্কৃতিতে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে এসে আলপনায় চিত্ররূপ পায়। আদিম মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে অবয়ব লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে দেখে এসেছে তা ছিল আজকের চাইতে অনেকানেক সরলরূপ। এই সরলতার এককেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করে এসেছে সৌন্দর্য-প্রিয় আদিম মানুষ।

আলপনা সম্ভবত সবচাইতে প্রাচীন শিল্পকলার এক বিবর্তিত রূপ যেখানে অঙ্কনের মূল কাঠানোটি আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। তাই তার সব প্রতীকই সরলরূপে প্রতিভাত। এ হয়তো আদিম গুহাচিত্রের এক উজ্জ্বল ভৌমাঙ্কন। অজন্তা-ইলোরায় এরই সৌকর্য বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে। আলপনার তন্বিষ্ঠ পাঠ করলে দেখা যাবে সেখানে পরিবেশিত চিহ্ন-সংকেতে পরিবেশ ভাবনা কতটা গভীরভাবে ধরা দেয়। মাঘমণ্ডলের আলপনা, পুণ্যপুকুর ব্রতের আলপনা-সহ নানান কামাত্মক আলপনায় সূর্য-চন্দ্র-তারা-নদী- সমুদ্র-পর্বত-বনানী এবং জৈববৈচিত্র্যের সমাহারে যে সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয় তা লোকশিল্পীর চেনা পরিচিত জগতের চিত্ররূপ। মানুষ যা দেখে তাই ভাবে, তাই আঁকা হয়ে ধরা দেয়। বিয়ের আলপনায় মাছ এসেছে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে। বিধবারা মাছ খান না, কেননা তাঁদের সামাজিক অনুশাসনে সৌভাগ্যরহিত করে রাখা হয়েছে। তাই বিয়ের আলপনা-সহ নানান কামাত্মক আলপনায় মাছের ব্যবহারের অর্থ দাঁড়ায় সিঁথির সিঁদুরকে অক্ষুণ্ণ রাখা। সাপ বংশবৃদ্ধির প্রতীক। সাপ বা সর্পিল রেখা অঙ্কনের অর্থ যৌনতার প্রকাশ, সন্তান উৎপাদনের আর্জি। কলা পুংজননাঙ্গের প্রকাশার্থে। সাপ প্রজননক্ষম নারীশক্তির প্রতীক। সাপের দুধ-কলা খাবার মিথ যতটা না বাস্তব, তার চাইতেও অধিক তার পরা-বাস্তবতা; লোকসমাজের ফার্টিলিটি কাল্ট।

দেবী লক্ষ্মী যেহেতু পদ্মাসনা, তাই পদ্মের মাধ্যমে লক্ষ্মীকে

অচলা করে রাখার প্রয়াস করেন বাঙ্গলার নারী। ধান, ধানছড়া, মরাই ইত্যাদি লক্ষ্মীর প্রতীক। আলপনায় কখনোও বাঁকা, কখনোও সরলরেখায় ধানের শীষ আঁকা হয়। ধানগাছ বাতাসের আন্দোলনে ঢেউ খেলে যায়, শস্যের ভারে নুয়ে পড়ে মাটিতে, ঝড়-বৃষ্টিতে শুয়ে পড়ে তার পাশকাঠি; ধানের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবত আলপনায় ধানের শীষ আঁকা হয় বাঁকা বা লতানো ভাবে। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় সুপারিবাগান আঁকা হয়। পান-সুপারি স্বামী-সোহাগের প্রতীক। পেটভরে খাবার পেলে তবেই শৃঙ্গারের সাধ জাগে নারীর হৃদয়ে, তখনই ঠোঁট লাল করে পান-সুপারি খান বিবাহিতা নারী। সেঁজুতি ব্রতে এমন স্বামী সেহাগের জীবন কামনা করা হয় প্রতিনিয়ত।

আজকের আলপনাতে অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার মিসিং লিংক চোখে পড়ে অনেক সময়। কৃষি সম্পৃক্ততার প্রকাশও নানাভাবে ধরা দেয়। মনে করা যেতে পারে, আলপনার যে জ্যামিতি, তার শুরুটা হয়েছিল সম্ভবত আদিম মানুষের বনচারী জীবন ছেড়ে বেরিয়ে চাষের জন্য জমি তৈরি করা ও সমতল করার প্রাচীন প্রক্রিয়া থেকে। জোয়াল বাহিত আদি লাঙ্গলের মৃত্তিকা খননে তৈরি হয়েছিল মাঠের আলপনা; তার দুপাশে গবাদি পশু ও আদিম কৃষকের পদচিহ্ন, ভূমিকর্ষণে উদ্ভূত পোকামাকড়ের লোভে ধেয়ে আসা পাখপাখালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন, সর্বোপরি মাঠভর্তি পাকা ধান-গমের সমারোহ — সব মিলিয়ে মানুষের সহজাত নান্দনিকতায় হয়ে উঠেছে ব্রত-পূজার আলপনার সমরূপ চিত্রাবলী। মানুষ বিশ্বাস করেছে, এমন চিত্র আঁকলেই বাস্তবে কৃষকের মাঠে আজও প্রভূত ফসল নিয়ে ধরা দেবে পৃথিবীদেবী। তাই আলপনা হলো মানুষের জাদুবিশ্বাস এবং নান্দনিকতার যৌথ ফসল।

আলপনার মধ্যেকার সংযোগ-সামর্থ্য বুঝে নিতে পারলে তার চিহ্ন-সংকেতগুলি ধরা সহজ হবে। আলপনায় লোকশিল্পী-মননে নীরব অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। এই যে প্রকাশ, এই যে অভিব্যক্তি, এই যে সংযোগ-সামর্থ্য, এর চারটি উপাদান। আলপনার সংযোগ-প্রক্রিয়ায় প্রেরক বা সেন্ডার্স হচ্ছেন ব্রতিনী নারী। বার্তা বা মেসেজ হলো নারীমনের বিচিত্র কামনা-বাসনার মনস্তত্ত্ব; মাধ্যম বা চ্যানেল হলো পিটুলিগোলা জল যা ভেজা চাল বেটে জলে গুলে তৈরি করা হয় এবং তার দ্বারাই ছবি আঁকা হয়। প্রাপক বা রিসিভার হলো সেই ব্যক্তি যে আলপনাকে অবলোকন করেন, পড়ার চেষ্টা করেন, শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করেন। দর্শক এভাবেই অতি পুরাতন অথচ চির নতুন শিল্পকর্মের কামনার নান্দনিক প্রকাশে অভিভূত হন। বুঝতে পারেন বাড়ি, রান্নঘর, গোরু-বাছুর, গোলাঘর, গয়নাগাটির ছবি এঁকে ব্রতিনী বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর পার্থিব বাসনা। তিনি তো এসব করেছেন ভাবজগতে পৌঁছে দিতে, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতা কাছে; যদি দেবতার আশিসে তিনি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় পৌঁছাতে পারেন, তাঁর স্বামী-ভাইয়ের কৃষি ও ব্যবসায় আয় বহুগুণ বেড়ে যায়।

এদিকে আলপনার রচনায়, নান্দনিকতায়, দর্শনে ও চিন্তনে স্রষ্টা ও দর্শকের মধ্যে যে সুকুমার হৃদয়বৃত্তির জন্মদান করে, তার ফলে উভয়েই এক সাংস্কৃতিক ঐক্য অনুভব করে। এর মধ্যেকার শুভশক্তি, সাংসারিক ঐক্য, গৃহজীবনের আনন্দ, পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা-- তাই নিমেষে পৌঁছে যায় দর্শকের হৃদয়ে।

কামনাত্মক আলপনার একদা মূল কামনা ছিল সন্তান যা গোষ্ঠীজীবনকে জনসম্পদে পরিপুষ্ট করে। তাই 'হাতে পো কাঁখে পো' আলপনায় নারীর কোলে-কাঁখে সন্তান খেলা করার ছবি। এর পরবর্তী চাহিদা শস্য উৎপাদন, শিকারের সহজলভ্যতা। মাটিতে সবুজ ফসল চাই, নদী-বিল-সাগরে প্রচুর মাছ, চিংড়ি আর কাঁকড়া শিকার চাই, গোয়াল ভরা গোরুর অঢেল দুধ চাই কামধেনুর মতো, আর বন থেকে চাই মধু, মোম, কাঠ বনজ সম্পদ। আবার বেলপুকুর ব্রতের মতো আলপনায় বটগাছ যেন প্রকৃতির সামীপ্য-সান্নিধ্যে থাকার আকুতি; তার সুপারিগাছ যেন আবাস সন্নিহিত সবুজ পরতে মাথা উঁকি দিয়ে ধরা দেয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্রততে পেঁচা যেন ধানজমিতে ইঁদুরের আক্রমণ প্রতিহত করবে। কৃষিক্ষেত্রে ইঁদুর খেয়ে এক সময়ে কৃষকের মন জয় করেছিল পেঁচা, তাই ধন্যবাদ দিতে পেঁচাই হয়ে উঠল ক্ষেত্রলক্ষ্মী, পরে দেবতার মানবীমূর্তিতে দেবী লক্ষ্মীর বাহন হয়ে উঠল সেই পেঁচা— এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস; আলপনাতেও তারই লোকস্মৃতি।

বউ-ছত্র, ঘাটলাজ আলপনায় আঁকা হয় পদ্ম; লক্ষ্মীপূজার আলপনাতেও পদ্মের ছড়াছড়ি। কোথাও আলপনায় পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, কোথাও দশদল, কোথাও শতদল পদ্ম, কোথাও যুগ্মপদ্ম, কোথাও শঙ্খপদ্ম। বিয়ের পিঁড়িতে আঁকা হয় শতদল পদ্ম। কেন আঁকা হয়? কারণ পদ্মফুল আমাদের চিন্তনে হয়ে উঠেছে নারীপ্রত্যঙ্গের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। পুরুষ যে নারীকে আজ গ্রহণ করতে চলেছে, সে হবে গর্ভবতী, কামনায় তার সর্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁত যোনী প্রার্থনা করছে বিবাহের দেবতার কাছে। আর আঁকা হয় ফলন্ত কলাগাছ; নারী তার পুরুষটিকে যেভাবে কামনা করছে আজ। কাজেই বিবাহের আলপনার প্রতীক চিহ্নগুলি হলো পদ্ম, কলা; আর আঁকা হয় প্রজাপতি, আনন্দের বর্ণমালা; আঁকা হয় মৌচাক— নারী-পুরুষের বৈবাহিক জীবনের আনন্দমালা; আঁকা হয়ে থাকে মাছের ছবি যা সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক।

তথ্যসূত্র :

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ চক্রবর্তী (১৪১২) আলপনার জৈববৈচিত্র্য, লোকসংস্কৃতি গবেষণা ১৮ (১) : ৬৮-৭৫।

এক মহাজীবন

দানবীর রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মন্দার গোস্বামী

আজ থেকে একশো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ঋণগ্রস্ত এক ব্যক্তি দিশেহারা অবস্থায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়। বহু চেষ্টার পর এর-ওর কাছ থেকে কোনোওভাবে চারশো টাকা জোগাড় করে নিজের গ্রাম বর্ধমানের মাথরুনে ফিরলেন। দেখলেন এক অতি দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার আশায় অপেক্ষা করছেন। ব্রাহ্মণের বাড়িটি বন্ধক রাখা ছিল, ধার শোধ করতে অপারগ হওয়ায় বাড়ি থেকে উৎখাত হয়েছেন। ব্রাহ্মণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যিনি যেকোনো বিপদে-আপদে সকলের পাশে থাকেন, ধারদেনা করেও অপরের সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় বের করবেন। উপায় অতি সহজেই হয়ে গেল। ধার করে জোগাড় করা চারশো টাকা থেকে ব্রাহ্মণকে ঋণ শোধের জন্য ৩৯৯ টাকা ২৫ আনা ৩ পাই দিয়ে হাতে মাত্র একটি পয়সা নিয়ে মহানন্দে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। সহধর্মিণী কাশীশ্বরী দেবী স্বামীর মুখে সব শুনে স্বামীগর্বে গর্বিত হলেন।

হ্যাঁ, এই ব্যক্তিই পরবর্তীকালের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। নিতান্ত দীনহীন অবস্থা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে দানে দানে নিঃস্ব হয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন কলির দাতাকর্ণ। তাঁর সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'এতদিন আমি ভাবিতাম এই জগতের মধ্যে বুঝি আমার পারসি বন্ধুদের তুলনা নেই। এখন দেখিতেছি যে সে ধারণা শুধুমাত্র সম্প্রদায় হিসেবে তাদের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন প্রার্থীর কথাও আমার মনে পড়ে না যাহার দান কাশিমবাজারের দানকে অতিক্রম করিতে পারে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ' এতদিন পরে একজন ধনী দেখিতে পাইলাম যিনি ধনের মর্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। ইনি যেমন অন্তরের সহিত বিনয়ী তেমনই দেশের সদনুষ্ঠানে ইহার উৎসাহ একান্ত অকৃত্রিম।' কাজী নজরুল তাঁর 'মণীন্দ্র প্রয়াণ' কবিতায় লিখেছেন,

'দানবীর,
ইন্দ্র কুবের লক্ষ্মী আশিস ঢেলেছিল যত শিরে

দুহাতে ভরিয়া ক্ষুধিত মানবে দিলে তাহা ফিরে ফিরে।
যে ঐশ্বর্য লয়ে এসেছিলে তাহারই গর্ব লয়ে
করেছ প্রয়াণ পুরুষশ্রেষ্ঠ উঁচু শিরে নির্ভয়ে।'

অথচ কী আশ্চর্য, এই ব্যক্তিই বাল্যকাল থেকে দুঃখ ও অর্থাভাবের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। জন্ম ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে। শ্যামবাজার, কলকাতায়। পিতা নবীন চন্দ্র। মাতা গোবিন্দসুন্দরী। জন্মের দু'বছরের মধ্যে মাতৃহারা হন। শিক্ষা প্রথম শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল। পরবর্তীকালে হিন্দু স্কুল। বারো বছর বয়সে পিতৃহারা হন। এরপর শারীরিক কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গণিত, সাহিত্য ও ভূগোল শিক্ষালাভ করেন। স্কুলজীবনে শিক্ষার্থী হিসেবে ততটা উজ্জ্বল না হলেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর অপরিসীম কৌতূহল ছিল যা পরবর্তীকালে তাঁকে এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। কাশিমবাজার এস্টেটের মহারাজা রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী মহারানি স্বর্ণময়ী দেবীর মৃত্যুর পর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের উত্তরাধিকার লাভ করে। এরপর ১৮৯৮-এর ৩০ মে তিনি মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথাগতভাবে স্কুল-কলেজে না পড়লেও প্রবল বিদ্যোৎসাহী

ছিলেন। জনকল্যাণমূলক যেকোনো কাজের জন্য তাঁর সাহায্যের হাত সদাসর্বদা প্রসারিত থাকত। যে দেশ বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ ঋকবেদ, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববাসীক দিয়েছে, যে দেশ ঘোষা অপালা, লোপামুদ্রা, গার্গী, লীলাবতীর মতো বিদুষী কন্যার জন্ম দিয়েছে, সেদেশের বিশেষ করে নারীশিক্ষার করুণ অবস্থা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাঁর সময়ে এমন কোনো সারস্বত বা সেবা প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে বঞ্চিত হয়েছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর কে এন কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা অ্যালবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠ হসপিটাল, বহরমপুর হাসপাতাল, বেঙ্গলি পত্রিকা, কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটাল ইত্যাদি। দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর অর্থানুকূল্যে প্রতিপালিত হতো। সৈদাবাদ অঞ্চলে তাঁর নামঙ্কিত মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ জেলার একটি বিশিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়। কেবলমাত্র বহরমপুর অথবা কাশিমবাজার নয়, কলকাতা-সহ অন্যত্রও বহু দুঃস্থ বিদ্যার্থীর আশ্রয়, জামা-জুতো, টিফিন, শিক্ষাবৃত্তির সম্পূর্ণ খরচ জোগাতেন তিনি। তাঁর অর্থ সাহায্যে বহু ছাত্রাবাস পরিচালিত হতো। এর জন্য ঋণ নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

মণীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো তাঁরই জমিতে বাঙ্গালি সাহিত্য সাধনার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন নির্মাণ। মূলত তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কাশিমবাজার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও সংগীত অ্যাকাডেমি, নাট্য অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অতি উল্লেখযোগ্য।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত মণীন্দ্রনাথ স্বদেশি শিল্প স্থাপনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে যে ঐতিহাসিক সভা হয়েছিল তার সভাপতিও ছিলেন তিনি। এই সভাতেই বিলিতি বস্তু বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্রিটিশ দমননীতির তীব্র বিরোধী মণীন্দ্রচন্দ্র গোপনে বিপ্লবীদের সহায়তা করতেন। ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে ইংরেজ শাসক তাঁর 'মহারাজ' উপাধি কেড়ে নিতে চাইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন—' মহারাজা মণীন্দ্রের চেয়ে মণীন্দ্রবাবু হয়ে থাকাই তাঁর কাছে বেশি ভালো।' এরপর তাঁরই উৎসাহে একের পর এক স্বদেশি কারখানা স্থাপিত হয়। বেঙ্গল পটারি, হাতিবাগানের টিন প্রিন্টিং, সিংভূম চীনীমাটির খনি, নলহাটিতে পাথরের খাদান কারখানা, বহরমপুর উইভিং ফ্যাক্টরি, জাহাজ-কয়লা-রেলপথ, মোটর, ট্যানারি, ছাপাখানা, তেলকল, ব্যাঙ্ক, সমবায়, অভ্র—সর্বক্ষেত্রে মণীন্দ্রচন্দ্র দান অথবা বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বদেশি শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সুচারু রূপে চলতে পারে তারজন্য কয়েকটি কারিগরি বিদ্যালয়েও প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছিলেন। স্বদেশি শিল্পের পাশাপাশি মানুষ যাতে নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলি পেতে পারে তারজন্য তিনি বহুবার নাগরিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। বহরমপুর পুরসভা, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে রাজ্য ও তৎকালীন কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিষদের সদস্য হিসেবে অসংখ্য জনকল্যাণকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলে পরম বৈষ্ণব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। ১৯১৫ সালে হরিদ্বারে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে তিনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন। বহু দুঃস্থ গ্রন্থকার তাঁর অর্থানুকূল্যে পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ধর্ম সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি 'শ্রী গৌড় রাজর্ষি', 'ভক্তি সাগর', 'বিদ্যারঞ্জন', 'ভারত ধর্মভূষণ', 'দান কল্পতরু' ইত্যাদি নানা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই পরের জন্য এবং ইহার জন্য আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্মচারী মাত্র'। শুধু তিনি নন, পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী, পুত্র এমনকী পরবর্তী প্রজন্মও দানশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিড়ম্বনা এই যে আজকের তথাকথিত ঐতিহাসিকরা মুর্শিদাবাদকে নবাবের জেলা বলে প্রতিনিয়ত ঢক্কানিনাদ করেন, অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নবাবদের কোনো অবদান নাই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অবদান রাজ্য তো দূর, জেলারই-বা কতজন জানেন?

কালক্রমে বিভিন্ন দিকে ক্রমাগত অর্থ সাহায্যের কারণে এক সময় মহারাজ সত্যিই নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। তাঁকে ধার নেওয়া শুরু করতে হলো। যদিও দান খয়রাতি আগের মতোই চলতে থাকল। একটা সময় নিরুপায় হয়ে তাঁকে এক সাহেব কোম্পনি থেকে এক কোটি টাকা ধার নিতে হয়। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মহারাজের শরীর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়তে শুরু করল। 'দানে দানে নিঃস্ব' মণীন্দ্রনাথের সমস্ত সম্পত্তি এক সময় কোর্ট অব ওয়ার্ডেসর অধীনস্থ হয়ে যায়। এরপর তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয়। সেখানে খ্যাতনামা চিকিৎক ডাঃ নীলরতন সরকার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অবশেষে ১৯২৯ সালের ১২ নভেম্বর এই দানবীর অমৃতলোকে প্রস্থান করলেন। কাজী নজরুল লিখলেন—

'দানবীর, এতদিনে নিঃশেষে করিলে তোমার নিজেরে দান/ মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি তোমার অমৃত প্রাণ।' □

পাক থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া পক

দুর্গাপদ ঘোষ

কোনো একজন রাজনৈতিক নেতার অদূরদর্শী নির্বুদ্ধিতার ফলে একটা বিরাট অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের জীবন কীভাবে নরককুণ্ডে চলে যেতে পারে তার উদাহরণ খুব বেশি নেই। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম এক বিরল উদাহরণ মনে হয় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের দখলে চলে যাওয়া জম্মু-কাশ্মীরের (এক-তৃতীয়াংশ) এলাকা। যাকে এখন Pak occupied Kashmir বা 'পক' (POK) বলা হচ্ছে। ভারতীয় ভাষায় 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর'। এক্ষেত্রে 'অধিকৃত'-র বদলে জবরদখলীকৃত বা Pak grabbed শব্দটাই যথোপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অধিকৃত শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও অধিকারের একটা সম্পর্ক থেকে যায়। পক-এর ক্ষেত্রে যেটা কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। এবছরের মধ্য আগস্টে তালিবানদের সঙ্গে সাধারণ পোশাকে পাকিস্তানি সেনাদেরও পাঠিয়ে দিয়ে যেভাবে আফগানিস্তান কবজা করা হয়েছে ১৯৪৮ সালের ২২ অক্টোবর ঠিক একইভাবে জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান থেকে 'হানাদার' ও সেনা পাঠিয়ে সেখানকার একাংশ জবরদখল করে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। সেদিন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে কথা বলেন এবং (২৭ অক্টোবর) আইনিভাবে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করান। অতি দ্রুত তৎপরতায় কাশ্মীরে সেনা পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও গোলওয়ালকরের (শ্রী গুরুজী) সঙ্গে কথা বলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দিয়ে শ্রীনগর বিমানবন্দরের রানওয়ের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করান। সঙ্ঘের সহযোগিতায় এবং নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে প্যাটেল যদি সেদিন তা না করতেন তাহলে বলা বাহুল্য কেবল পাক দখলীকৃত কাশ্মীরই নয়, সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের জীবন যে একই নরককুণ্ডে চলে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ যাঁরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত জম্মু-কাশ্মীরে রয়েছেন, পাক জবরদখলিকৃত কাশ্মীরের মানুষের জীবন যন্ত্রণা দেখে মনে হয় তাঁরাই সবচাইতে ভালোভাবে অনুভব করতে পারছেন সর্দার প্যাটেল এবং শ্রীগুরুজী জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য কী অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। অন্যদিকে পক-এর মানুষরাও মনে হয় বুঝতে পারছেন যে সেদিন জওহরলাল নেহরু যদি ভারতের তরফে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না করে পাক বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে পাকিস্তানের দিকে যেভাবে দৌড়ে পালাচ্ছিল সেইভাবে পুরো কাশ্মীর ছেড়ে তাদের যদি পালিয়ে যেতে দিতেন তাহলে পকবাসীর জীবনে পাকিস্তানি নির্যাতনের যে অভিশাপ নেমে এসেছে তা হতো না। সেদিন পণ্ডিত মশাইয়ের মূর্খামির ফলে তাঁদের জীবনে যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে তা করতে হতো না। নিত্যদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্থির জীবন বয়ে বেড়াতে হতো না। নেহরুর নির্বুদ্ধিতার কারণে পকবাসীর অবস্থা আজ যাকে বলে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। আইনত তাঁরা ভারতভুক্ত। কার্যত পাকিস্তানের পদদলিত। পাক সেনার বুটের তলায় নিষ্পেষিত। সে

নিষ্পেষণ যে কী যন্ত্রণাদায়ক বার বারই তা প্রকাশ্যে এসেছে। নিরন্তর প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তাঁরা না পারছেন তা বরদাস্ত করতে, না পারছেন পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে। কেবল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই-এর দমন পীড়নই নয়, পাশাপাশি বরদাস্ত করতে হচ্ছে একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ পাওয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের দাপাদাপিও। আইএসআই-এর পোষা লস্কর-ই-তৈবা, জামত-উদ-দাওয়া, জৈশ-ই-মহম্মদ, হিজব-উল-মুজাহিদিন প্রভৃতি জঙ্গিরাও ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। পাক সেনার পাশাপাশি এই সমস্ত জঙ্গিবাহিনীর হিংস্র নখদন্তের শিকার হতে হচ্ছে পকবাসীদের। কারও বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দটি না করতে পেরে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছে তাঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা,

ফ ঃ ৫

মৌলিক অধিকার, সমস্ত কিছু। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এমনও জানতে পারা যাচ্ছে যে ভারতভুক্ত কাশ্মীর থেকে সেনাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের পোষা জঙ্গিরা কাপুরুষতার গ্লানির ঝাল মেটাতে পকের জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার (Line of actual control) কাছাকাছি থাকা গ্রামে গ্রামে বন্দুক উঁচিয়ে দাপাদাপি করে। তাদের ভয়ে সেখনকার মেয়ে-বউদের দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়। কেউ কোনো প্রতিবাদ করার সাহস করে না। কালেভদ্রে কেউ তা করলে জঙ্গিদের হাতে নির্যাতন তো আছেই। তেড়ে আসে পাক সেনারাও। প্রতিবাদী জনতার নেতৃত্বদানকারীদের ওপর আসুরিক নির্যাতন চালায়। অপহরণ করে নির্বিচারে হত্যা করে।

এরকম কিছু ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন পকের রাজধানী মুজফ্‌ফরাবাদের ডাঃ রিজওয়ান। ২০১১ সালের ৭ মে তাঁকে তাঁর বাসস্থান থেকে অপহরণ করা হয়। ১৫ দিন ধরে পৈশাচিক নির্যাতনের পর ২৩ মে তাঁকে হত্যা করে তাঁর বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়া হয়। স্পষ্টতই আই এস আই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু গত এক দশকেও তার কোনো বিচার হয়নি। ইউনাইটেড কাশ্মীর পিপলস ন্যাশনাল পার্টি, আজাদ কাশ্মীর চ্যাপ্টার-এর সভাপতি আফজল সুলেরিয়া এই ঘটনার কথা জানিয়ে বলেন যে, আই এস আই-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েও কোনো লাভ হয়নি। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে আব্বাস বাট, ড. সাবির চৌধুরী, আসীম মির্জা, নওয়াজ মজিদের মতো আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। কিন্তু পাক কর্তৃপক্ষ তা কোনো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। এনিয়ে সোচ্চার হয়েছিল সর্দার আরিফ সহিদের নেতৃত্বাধীন অল পার্টিস ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (এ পি এন এ)। টানা দু'বছর ধরে তারা পাকিস্তানি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকেন। পাক সেনারাও যথারীতি মাঠে নেমে পড়ে। মাঝে মাঝে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। পক ছাড়িয়ে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত। সেখানেও আরিফ যখন প্রতিবাদের স্বর চড়াতে থাকেন তখন ২০১৩ সালের ১৪ মে সাতসকালে রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁর বাড়ির সামনেই প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। ওই হত্যাকাণ্ডও আই এস আই করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু পাক সরকার তা কানেই তোলেনি। পাক কর্তারা মনে করেছিলেন ডাঃ রিজওয়ানকে সরিয়ে দিলে মুজফ্‌ফরাবাদ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা হয়নি। উলটে আন্দোলন রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত আছড়ে পড়েছিল। সর্দার আরিফকে সরিয়ে দিলে জবরদখলীকৃত কাশ্মীরি জনতার মুখ বন্ধ হয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে মনে করেছিলেন আই এস আই কর্তারা। বদলে ক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যে আন্দোলন ছিল কেবল আই এস আই-এর বিরুদ্ধে তা গোটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের রূপ নেয়। ২০১৯ সালের অক্টোবরে মুজফ্‌ফরাবাদের রাজপথে হাজার হাজার মানুষ নেমে এসে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এর ডাক দিয়েছিল পিপলস ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (পি এন এ)। তারা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার ডাক দিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। কিন্তু নিজেদের অপরাধ ঢাকতে পাক কর্তারা তাঁর পিছনে নরেন্দ্র মোদীর ভারতের 'উস্কানি'-র গন্ধ খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং সশস্ত্র বাহিনীকে মিছিল-মিটিং ঠেকানোর হুকুম জারি করেন। তারা মিছিলের ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনীর হামলায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়। এর ১০ মাসের মাথায় ২০২০ সালের ২১ আগস্ট তনবির আহমেদ নামে এক প্রতিবাদী দাদিয়ালে একটা সরকারি উদ্যানে ঢুকে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা টেনে নামিয়ে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে নিয়ে যায়। সে বছরের নভেম্বরে তাঁর স্ত্রী বি বি সি-কে জানান যে, গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে তনবির অনশন শুরু করে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি। কেবল তাই নয়। ওই অবস্থাতেও তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া হয়। তনবিরের বক্তব্য ছিল, পক আইনত পাকিস্তানভুক্ত নয়। সুতরাং সেখানে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ওড়ানোটা বেআইনি এবং পকের স্বাধীকার হরণ করা। এটা হতে দেওয়া যায় না। এরকম আরও অনেক নেতাকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে গ্রেপ্তার কিম্বা অপহরণ কিম্বা গুপ্তহত্যা করা হয়েছে বলে আই এস আই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে। কিন্তু একটা ক্ষেত্রেও সুবিচার মেলেনি। সদুত্তর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

নেহরুর চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার কারণে কাশ্মীরের এই যে অংশ পাকিস্তানের জবরদখলে থেকে গেছে সেখানকার মানুষ ১৯৫০ সাল থেকেই নিজেদের 'আজাদি' বা স্বাধীনতার দাবি তুলে আসছেন। প্রথম পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান অঞ্চলটাকে 'আজাদ কাশ্মীর' আখ্যা দিলেও পাকিস্তানের হাত থেকে তাঁদের কোনোদিনই আজাদি মেলেনি। তবে ভারতভুক্ত জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বরাবরই পক-এর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নির্ধারিত থাকলেও পকেও একটা আইনসভা তৈরি করিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সেটাকে কোনো সংসদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পকের নেতারা তাঁদের এই আইনসভাকে পাকিস্তানের কোনো অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা মানতে কোনোদিনই রাজি হন নি। এখনো রাজি নন। কিন্তু পাক কর্তৃপক্ষ বরাবরই এই আইনসভার ওপর বেআইনিভাবে নিয়ন্ত্রণ চালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, আইএসআই প্রথম থেকেই ভারতভুক্ত কাশ্মীরি জনতাকে 'আজাদি'-র নামে সশস্ত্র সন্ত্রাসে উস্কানি এবং সমস্ত রকমের মদত দিয়ে আসছে। প্রথম প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকে এলএফ) এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত কনফারেন্স নেতাদের আজাদি আন্দোলনকে বৃহত্তর স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের আন্দোলন বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন পকের লোকেরা। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা বুঝতে পেরে যান যে 'আজাদ কাশ্মীর' আন্দোলনকারীরা আসলে সব পাকিস্তানপন্থী এবং তাঁরা কাশ্মীরের দুই অংশকেই পাকিস্তানভুক্ত করতে চান। যেটা পাকিস্তানের নির্যাতনে যন্ত্রণাকাতর পকবাসীরা কখনোই চায়নি, এখনো তা মানতে রাজি নয়। উলটে সেখানকার অনেকেই বালুচিস্তানের মতো ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে মরিয়া। ভারতের মোদী সরকার যখন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে বায়ুসেনা পাঠিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন দু'বারই পকের মানুষ ভারতপন্থী স্লোগানে মুখর হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ধ্বনি উঠেছিল 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'।

পকবাসীদের জীবনে ১৯৭৪ সালটা একটা 'অভিশাপ'-এর বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যে বছরকে তাঁরা 'Black year' বা কালাবর্ষ বলে মনে করেন। তার আগে পর্যন্ত পকের শাসনকর্তাদের একাংশ পাকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পুরোপুরি 'আজাদ' হওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন কুচক্রী পাকিস্তানের খপ্পরমুক্ত হলে পকের নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের দিক থেকে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতেও তাঁদের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু সেটা যাতে না হয় সেজন্য ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সম্পূর্ণ বেআইনি এবং গায়ের জোরে পকের সংবিধানের মধ্যে নতুন কিছু বিধিনিষেধ ঢুকিয়ে দিয়ে অঞ্চলটাকে পুরোপুরি

পাকিস্তানের কবজায় রাখার ব্যবস্থা করে। তার ফলে পকবাসীর জীবনে সামান্য যেটুক স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল তাও খর্ব হয়ে গেছে। যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। ১৯৭৪-এর থেকে কেউ নির্বাচন প্রার্থী হতে চাইলে তিনি যে পকের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিকেই সমর্থন করেন এবং করবেন এরকম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সরকারি চাকরির জন্যও পকের লোকেদের পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য পোষণের লিখিত অঙ্গীকার করতে হবে। পৃথক বা স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষে কোনো অহিংস পদক্ষেপ নিলেও তার বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। হিউম্যান রাইট ওয়াচ-এর এশিয়া ক্ষেত্রের ডিরেক্টর ব্রাট অ্যাডামস জানিয়েছেন যে 'পক-এর জনগণের জীবন থেকে রাজনীতির মৌলিক অধিকারটুকুও হরণ করেছে পাকিস্তান।' পাশাপাশি ভারতভুক্ত কাশ্মীরে মানবাধিকার তথা মৌলিক অধিকারের ব্যাপারটা পক-এর চাইতে 'অনেক—অনেক —অনেক ভালো' বলেও জানিয়েছেন তিনি। অ্যাডামস-এর এই মন্তব্যের যার পর নাই গাত্রদাহ হয়েছে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী তারিক আজিম খানের।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পকবাসীর ক্ষোভ কেবল মুজফ্ফরাবাদ- কেন্দ্রিক নয়, প্রায় সর্বত্রই তা ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত সম্প্রসারিতও হচ্ছে। অবস্থার এতটাই অবনতি হয়েছে যে তা সামাল দিতে পাক কর্তৃপক্ষের এখন প্রায় নাজেহাল অবস্থা। ১৯৭৪ সালের পর থেকেই পাকিস্তানের জবরদখলীকৃত কাশ্মীরের সর্বত্রই মৌলিক, রাজনৈতিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে চলছে বিষোদ্গার, প্রতিবাদী আন্দোলন। পকের অন্তর্ভুক্ত গিলগিট-বাল্টিস্তানে প্রায়দিনই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবাদী জনতা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও তাঁদের ওপর পাক সেনাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রায় রোজই পথে নামছেন। সম্প্রতি পরপর চারদিন ধরে লাগাতার পথে নেমে সোচ্চার হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। স্লোগান দিয়েছেন 'ইয়ে যো দেহ্শাদগর্দি হ্যায়, উসকে পিছে উর্দি হ্যায়' (এই যে হিংসা চালানো হচ্ছে তার পিছনে উর্দি বা পাক সেনারা রয়েছে)। এইসব প্রতিবাদী বিক্ষোভে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ পুরুষ-মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলেই শামিল হচ্ছেন। পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ তথা নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে সকলেই মরিয়া হয়ে উঠেছেন। পকের সংবিধানে পাকের এই অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় সরকার তথা পক প্রশাসন কার্যত পঙ্গু, পাকিস্তানের হাতের পুতুলে পরিণত হতে বাধ্য হয়ে পড়েছে। অন্যথায় 'সংবিধান অমান্য' করার দায়ে পক সরকারকে খারিজ করে দেবার হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে পক প্রশাসনকে।

পাক সরকারের দমন পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া সে দেশের অনেক অঞ্চলের মানুষ। তবে অন্যদের যন্ত্রণা বালোচ এবং পাক জবরদখলীকৃত কাশ্মীরের মানুষের মতো ভয়ানক নয়। পকবাসীর যন্ত্রণা বালোচদের মতোই মাত্রাছাড়া হয়ে গেছে। এখন পকবাসীরাও বালোচদের মতো যেকেনো মূল্যে পাকিস্তানের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন।

পাক সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কেবল পাকিস্তানের জবরদখলীকৃত কাশ্মীরের সাধারণ জনগণই নয়, মানবাধিকারবাদী অনেক সংগঠনও পাক কর্তাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছে। পাকিস্তানের মধ্যে গঠিত হওয়া মানবাধিকার কমিশনের (এইচআরসিপি) অভিযোগ, পকে শুধু স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষদের ওপরেই নয়, সংবাদমাধ্যমের ওপরেও আই এস আই-এর শকুনের দৃষ্টি পড়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলোর যে সমস্ত সাংবাদিক পাকিস্তানি নির্যাতন ও মানবাধিকার হরণের খবর প্রকাশ করছেন তাঁদের অনেককে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। এশিয়ান লিগাল রিসার্চ সেন্টার (এ এল আর সি) জানিয়েছে যে, পাকিস্তানের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া পকের ডজন ডজন মানুষ বেমালুম নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁরা কোথায় আছেন, কেমন আছেন, জীবিত আছেন কী না ইত্যাদির কোনো হদিশ মিলছে না। এসবের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আই এস আই-এর হাত আছে বলে মনে করছে এই সংস্থা। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে 'অল আজাদ কাশ্মীর স্কুল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর ব্যানারে প্রায় ২০০০ শিক্ষক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পথে নামলে নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার শিকার হতে হয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এর কয়েক দিন পরে খুঁজে খুঁজে ৬৮ জনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় এক বছর হতে চলল এখনো কয়েকজনের কোনো খবর নেই। তাঁরা বেঁচে আছেন কীনা কেউ জানে না। পাকিস্তানি নির্যাতনের এসব খবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন (ইউ এন এইচ আর সি)-এর কাছেও পৌঁছেছে। ব্রিটেন-কেন্দ্রিক 'মোহাজির কৌমি মুভমেন্ট' (এম কিউ এম)-এর এক নেতা আরিফ আজাকি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানিয়েছেন যে পাক সেনারা জবরদখলীকৃত কাশ্মীরে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রয়োজনে তদন্ত করে যথাসত্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক বলেও দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, মোহাজিররা হলো ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরি হবার পরে যারা ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যায়, যারা বা যাদের পূর্বপুরুষরা দেশভাগের আগে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন করেছিল। পাকিস্তান এখনো তাদের নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছে। পাকিস্তানে এবং বিশেষ করে সিন্ধু প্রদেশে তাদের ওপরও সরকারি সন্ত্রাস চলে আসছে। এছাড়া বেশ কয়েকবার 'পাঠান'-দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও হয়েছে। সেসব সংঘর্ষ প্রকাশ্য রাজপথেও নেমে এসেছে। অনেকে নিহতও হয়েছে। প্রায় ৫ দশক আগে এম কিউ এম গঠন করে তারা পাক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মোহাজির নেতারা বেশ কয়েকবার অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে পাক সরকার সশস্ত্র 'পাঠান'-দের লেলিয়ে দিয়ে সরকারি সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সিন্ধু প্রদেশেও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে 'জিয়ে সিন্ধ আন্দোলন' (জে এস এস)। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কয়েক দশক ধরে পাক-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নেতা প্রয়াত গুলাম মহম্মদ সইদ 'স্বাধীন সিন্ধুস্তান'-এর দাবিতে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। এককথায় পাক সরকারের দমন পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া সে দেশের অনেক অঞ্চলের মানুষ। তবে অন্যদের যন্ত্রণা বালোচ এবং পাক জবরদখলীকৃত কাশ্মীরের মানুষের মতো ভয়ানক নয়। পকবাসীর যন্ত্রণা বালোচদের মতোই মাত্রাছাড়া হয়ে গেছে। এখন পকবাসীরাও বালোচদের মতো যেকেনো মূল্যে পাকিস্তানের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। ◻

আসন পুনর্বিন্যাস জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনাপ্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে মার্চ, ২০২০-তে গঠিত 'আসন পুনর্বিন্যাস কমিটি' (ডি-লিমিটেসন কমিশন) তাঁদের প্রস্তাবিত খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার আসন সংখ্যা ১০৭ থেকে বেড়ে ১১৪টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রথম ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আসন পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে ওই রাজ্যে; এর আগে জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী আসন পুনর্বিন্যাস করা হতো। যাইহোক, বিজেপি বাদ দিয়ে অন্যান্য কাশ্মীর উপত্যকাভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

উপত্যকাভিত্তিক দলগুলি এই প্রস্তাবকে অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক বলে অভিহিত করেছে। প্রস্তাবে বর্ধিত সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে একটি উপত্যকার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাকি ছয়টি জম্মু অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। বিধানসভার আসন সংখ্যা বেড়ে জম্মুতে হয়েছে ৪৩টি এবং কাশ্মীর উপত্যকায় হয়েছে ৪৭টি। আসন সংখ্যার বিচারে এখনো কাশ্মীর উপত্যকার প্রাধান্য বজায় আছে। কিন্তু না, তাতে হবে না। কাশ্মীর উপত্যকার বংশবাদী দলগুলির আরও বেশি আসন চাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে এই দলগুলির 'দখলদারি' মনোভাব ঠিক বুঝতে পারব না।

উপত্যকার আসন সংখ্যার প্রাধান্যের কারণে ওই দলগুলিকে কেন্দ্র করে দু-তিনটি পরিবার জম্মু ও লাদাখের মানুষকে এযাবৎ বঞ্চিত করে এসেছে। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও জম্মু ও লাদাখবাসীদের ভাগ্যে জুটতো না। ওই বিরোধী দলগুলির মতে, ২০১১-র জনগণনার হিসেবে আসন সংখ্যার পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত। মজার ব্যাপার হলো, এ যাবৎ ঠিক উলটোটাই হয়ে এসেছে। তাঁরা কাশ্মীর উপত্যকার মানুষকে 'ক্ষমতাহীন' করার কথা বলছে। তাঁদের মতে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে কাশ্মীর উপত্যকার বদলে জম্মু অঞ্চল থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।

অদ্ভুত যুক্তি! জম্মু অঞ্চলের নেতার মুখ্যমন্ত্রী হতে কোনো সাংবিধানিক আপত্তি আছে কি? নাকি আবদুল্লাহ-মুফতিদের ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা ভেঙে যাবে। আবার অন্যদিকে জম্মুর বাসিন্দাদের মতে, তাঁদের ছয়টি আসন বাড়ানোর পরেও কাশ্মীর উপত্যকায় অধিক আসন রয়েছে যা তাঁদের জম্মুকে শোষণ করতে সাহায্য করবে। আবার ৩৭০ ধারা রদ করার পরে জম্মুর নাগরিকেরা আশা করেছিলেন, ডিলিমিটেশনে তাঁদের অঞ্চলের 'ক্ষমতায়ন' ঘটাবে। ডিলিমিটেশন কমিশনের প্রস্তাব তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

জম্মু ও কাশ্মীরের সঠিক রাজনৈতিক অবস্থান বুঝতে হলে রাজ্যের ভৌগোলিক এবং আগের প্রতিটি বিধানসভার গঠন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ডিলিমিটেশনের আগে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৮৭টি। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় ৪৬টি, জম্মুতে ৩৭টি, লাদাখে ৪টি এবং অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ধরে রাখা হয়েছিল ২৪টি। কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি আসনের জন্য এক লক্ষ ভোটার নির্ধারিত ছিল অথচ জম্মুর বিধানসভা প্রতি নির্বাচক সংখ্যা ছিল ১.৪ লক্ষ। আবার ভৌগোলিক দিক থেকে

কাশ্মীর উপত্যকার মোট আয়তন হলো ১৫, ৯৪৮ বর্গকিলোমিটার, অন্যদিকে জম্মুর আয়তন হলো ২৬,২৯৩ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ জম্মুর ভৌগোলিক আয়তন কাশ্মীর উপত্যকার থেকে অনেক বেশি। এই ধরনের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক তথ্য সামনে রেখে ডিলিমিটেশন কমিশনকে এগোতে হয়েছে। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত জম্মুর দিকটিও ভাবতে হয়েছে কমিশনকে।

গত বেশকিছু বছর ধরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহ, পিডিপি-র মেহবুবা মুফতি এবং বিজেপিকে কেন্দ্র করে। অন্যান্য দল জম্মু ও কাশ্মীরে নেহাতই প্রান্তিক শক্তিমাত্র। দিল্লি বা কলকাতায় বসে তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে যে মন্তব্যই করুক না কেন, তাঁর প্রতিধ্বনি ওই রাজ্যে শোনা যাবে না। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের একটা রাজ্যে একটা চরম সাম্প্রদায়িক সরকার চালাত ফারুক, ওমর আবদুল্লা ও মুফতিরা। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই কাজ করতে হয়েছে বিচারপতি রঞ্জনাপ্রকাশ দেশাইয়ের কমিটিকে। স্মর্তব্য যে, বিচারপতি দেশাই বাদে কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কে কে শর্মা; এছাড়া সহযোগী সদস্য হিসেবে আছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের তিন সাংসদ ফারুক আবদুল্লাহ, মোহম্মদ আকবর লোন ও হাসনাইন মাসুদি, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ এবং বিজেপি এমপি যুগলকিশোর শর্মা।

আসন পুনর্বিন্যাস কমিটি রাজ্যের ২০টি জেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়, যেমন জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক নানা তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ডাকা কমিশনের বৈঠকে সহযোগী ন্যাশনাল কনফারেন্সের তিন সদস্য 'জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্বিন্যাস আইন, ২০১৯'-কে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে যোগ দেয়নি। যাইহোক, সম্প্রতি ন্যাশনাল কনফারেন্স ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথোপকথনে রাজি। সুতরাং 'আসন পুনর্বিন্যাস কমিটি' আশাবাদী যে, কমিশনের আগামী বৈঠকে সহযোগী ওই তিন সদস্যও যোগ দেবেন।

কমিশনের প্রস্তাবিত 'খসড়ায়' রাজ্যের বিজেপি এবং গুজ্জর জনজাতির মানুষজন খুশি। গুজ্জর জনজাতির জন্য এই প্রথমবার ৯টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে খসড়ায়, যদিও তাঁদের দাবি ছিল ১২টি আসন সংরক্ষণের। আর তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে সাতটি আসন। বিজেপির মতে, এই খসড়া প্রস্তাবে জম্মু অঞ্চলের প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলার অবসান হবে। তাছাড়া তপশিলি জাতি ও জনজাতির প্রতিও সুবিচার করা হয়েছে কমিশনের এই প্রস্তাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার, এই রাজ্যের দুটি অঞ্চলের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ইত্যাদি একেবারেই ভিন্নমুখী, পরস্পরবিরোধী। জম্মু অঞ্চল চিরদিনই কাশ্মীর উপত্যকার দু-তিনটি পরিবারের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু কমিশনের এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ওই পরিবারগুলির এযাবৎকালের মৌরসিপাট্টা ভেঙে যাবে। পুরনো বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়াত কনফারেন্স এখন মৃতপ্রায়; সেখানে গুপকার গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার তথাকথিত স্বার্থ দেখার জন্য। এই গুপকার গোষ্ঠীর নেতা হলেন একটি মাত্র আসন পাওয়া সিপিএমের মহম্মদ ইউসুফ তারিগামি। আবার এঁদের মধ্যেও কোনো ঐক্য নেই। সম্প্রতি এই গোষ্ঠী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে পিপলস কনফারেন্সের সাজ্জাদ লোন।

আসন পুনর্বিন্যাস কমিটির খসড়া প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জম্মুর আসন সংখ্যা ৪৩ হওয়াতে জম্মুর লাভ হবে, না ৪৭টি আসন নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকা আগের মতোই জম্মুর উপর আধিপত্য বজায় রাখবে সে ভিন্ন কথা, তবে কাশ্মীর উপত্যকার সুবিধাভোগী দু-তিনটি রাজনৈতিক পরিবারের মৌরসিপাট্টা যে ভেঙে যাবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

আসন পুনর্বিন্যাস কমিটির খসড়া প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জম্মুর আসন সংখ্যা ৪৩ হওয়াতে জম্মুর লাভ হবে, না ৪৭টি আসন নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকা আগের মতোই জম্মুর উপর আধিপত্য বজায় রাখবে সে ভিন্ন কথা, তবে কাশ্মীর উপত্যকার সুবিধাভোগী দু-তিনটি রাজনৈতিক পরিবারের মৌরসিপাট্টা যে ভেঙে যাবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। যাইহোক, ২০২২-এ জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সূর্যোদয় ঘটবে এটাই আমরা আশা করব।

(লেখক ইতিহাস গবেষক ও প্রাবন্ধিক)

শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা

বিশ্বের প্রাচীনতম নগর বারাণসী বা কাশী। সংস্কৃত শিক্ষার পুরাতন কেন্দ্র এই কাশী। কাশীকে বাবা বিশ্বনাথের স্থান বা বিশ্বনাথপুরীও বলা হয়ে থাকে। বাবা বিশ্বনাথের মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি। একদিন বাবা বিশ্বনাথের পুরোহিত স্বপ্নে দেখলেন, বাবা বিশ্বনাথ আদেশ দিচ্ছেন মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণ লোকেদের একটি সভার আয়োজন করতে।

পুরোহিত পরের দিনই সারা শহরে এই কথা প্রচার করে দিলেন। কাশীর বিদ্বান ও সাধু-সন্ত, পুণ্যবান, দানশীল ব্যক্তিরা গঙ্গায় স্নান করে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সকলে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢাললেন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। সেদিন মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়। সবাই উপস্থিত হবার পর পুরোহিত সকলেকে তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা বললেন। সকলে 'হর হর মহাদেব' বলে জয়ধ্বনি দিয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বাবা বিশ্বনাথের স্তব করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর মহাদেবের স্তব ও কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ বন্ধ হলে সকলে দেখলেন মন্দিরের ভেতরটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছে। শিবলিঙ্গের কাছে দেখা গেল মূল্যবান রত্নখচিত একটা সোনার পাত । ওইসব রত্ন থেকে ঠিকরে আসা বর্ণালির আলোয় মন্দিরে ভেতরটা ঝলমল করছে। পুরোহিত ওই রত্নখচিত সোনার পাতটি তুলে নিয়ে দেখলেন তার ওপর হিরের অক্ষরে লেখা রয়েছে — ' শ্রেষ্ঠ দয়ালু ও পুণ্যাত্মার জন্য বাবা বিশ্বনাথের উপহার'।

পুরোহিত ছিলেন ঈশ্বরভক্ত ত্যাগী মানুষ। তিনি পাতখানি নিয়ে সবাইকে দেখালেন এবং বললেন, প্রতি সোমবার এই মন্দিরে বিদ্বান ব্যক্তিদের সভা বসবে। যিনি দয়ালু ও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান বলে নিজেকে প্রমাণ করবেন তাঁকে এই স্বর্ণপাতটি দেওয়া হবে।

সর্বত্র এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেল। দূরদূরান্ত থেকে তপস্বী, ত্যাগী, ব্রতধারী ও দানশীল ব্যক্তিরা কাশীতে আসতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ বেশ কয়েক মাস ধরে চন্দ্রায়ন ব্রত পালন করেছিলেন, তিনি স্বর্ণপাতটি নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁকে স্বর্ণপাতটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি মাটির পাতে পরিণত হয়ে গেল। ওর জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেল। লজ্জায় তিনি পাতটি ফেরত দিলেন। পুরোহিতের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার আগের আকার ধারণ করল আর তার রত্নগুলি আলোয় ঝলমল করে উঠল।

এক জন বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, বহু জায়গায় দানসত্র খুলেছেন। সেবাকাজ করার ফলে তিনি নিজের বিষয়সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছেন। এজন্য খবরের কাগজে তাঁর নাম ছাপা হতো। তিনি স্বর্ণপাতটি নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর হাতে যাওয়া মাত্র স্বর্ণপাতটি মাটিতে পরিণত হয়ে গেল। পুরোহিত বললেন, আপনি পদ, মান ও যশের আকাঙ্ক্ষায় দান করেন। যশের আকাঙ্ক্ষায় যারা দান করে তাদের দান শুদ্ধ হয় না।

এক জন বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, বহু জায়গায় দানসত্র খুলেছেন। সেবাকাজ করার ফলে তিনি নিজের বিষয়সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছেন। এজন্য খবরের কাগজে তাঁর নাম ছাপা হতো। তিনি স্বর্ণপাতটি নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর হাতে যাওয়া মাত্র স্বর্ণপাতটি মাটিতে পরিণত হয়ে গেল। পুরোহিত বললেন, আপনি পদ, মান ও যশের আকাঙ্ক্ষায় দান করেন। যশের আকাঙ্ক্ষায় যারা দান করে তাদের দান শুদ্ধ হয় না।

এরপরও বহু লোক এল কিন্তু কেউই স্বর্ণপাতটি নিতে পারল না। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বহু লোক স্বর্ণপাতটি পাবার আশায় মন্দিরের কাছেই দানধ্যান আরম্ভ করে দিল কিন্তু তারাও স্বর্ণপাতটি পেল না। একদিন এক বৃদ্ধ চাষি বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে এল। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। সে শুধু বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতেই এসেছিল। তার কাছে কাপড়ের খুঁটে বাঁধা সামান্য মুড়ি আর একটা ছেঁড়া কম্বল ছিল। মন্দিরের কাছেই গরিব দুঃখীদের কাপড় ও খাবার বিতরণ করা হচ্ছিল। মন্দির থেকে কিছু দূরে একজন কুষ্ঠরোগী ভিক্ষা পাবার জন্য চিৎকার করছিল। কিন্তু উঠে আসতে পারছিল না। তার সারা শরীর ঘায়ে ভর্তি। খিদেয় ছট ফট করছিল কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও দেখছিল না। বৃদ্ধ চাষির দয়া হলো। সে তার মুড়ি তাকে খেতে দিয়ে নিজের কম্বলটি তার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে এল। মন্দিরের পুরোহিত আগে থেকেই নিয়ম করেছিলেন যারাই ঠাকুর দর্শন করতে আসরেন তাদের সবার হাতেই স্বর্ণপাতটি দেওয়া হবে। বৃদ্ধ চাষি যখন ঠাকুর দর্শন করে বাইরে এল তখন পুরোহিত স্বর্ণপাতটি তার হাতে দিলেন। দেওয়া মাত্রই স্বর্ণপাতের রত্নগুলো দ্বিগুণ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবাই তখন সেই বৃদ্ধকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

পুরোহিত বললেন, এই স্বর্ণপাত বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নির্লোভ, যে দীন দুঃখীর সেবা করে, যে নিঃস্বার্থভাবে দান করে সে-ই সব থেকে শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

নবজীবন ঘোষ

বিপ্লবী নবজীবন গোষ ১৯১৬ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের অনেকেই বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাই নির্মলজীবন ঘোষ একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ইংরেজ শাসক নবজীবনকে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কার করলে তিনি ফরিদপুরে আত্মগোপন করে থাকেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দি অবস্থায় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে ১৯৩৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জেল হেফাজতে মৃত্যু এবং মেদিনীপুর জেলা জুড়ে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জানো কি?

- অজন্তা গুহার বিষয়বস্তু জাতকের গল্প।
- আঙ্কোরভাট মন্দিরের বিগ্রহ ভগবান বিষ্ণুর।
- ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় ৭১২ খ্রিস্টাব্দে।
- মহাকবি কালিদাস ২য় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন।
- তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজ মূর্তি জগদ্বিখ্যাত।
- ভারতে গণিতশাস্ত্রে শূন্যের আবিষ্কার হয় গুপ্তযুগে ।
- ফা-হিয়েন ১৫ বছর পর্যটক হিসেবে ভারতে ছিলেন।

ভালো কথা

ভুরুকুচকা

আমাদের বাড়িতে বড়ো হয়ে ওঠা কুকুরটির নাম ছিল ভুরুকুচকা। ওর এই অদ্ভুত নামকরণের পেছনে একটি কারণ আছে। সেটা হলো ওর কোচকানো ভুরু। ও আমাদের বাড়ির সকলের খুব প্রিয় ছিল। ও দিনের বশিরভাগ সময় আমাদের বাড়ির বাগানে কাটাত। পাড়ার

সবার বাড়িতে ও খুব আদর যত্ন পেত। এর কারণ হচ্ছে ওর শান্ত স্বভাব। সবার অত আদর যত্ন পেত বলে পাড়ার অন্য কুকুর ওকে পছন্দ করত না। একদিন সকালে উঠে দেখি ও আমাদের বাগানে নেই। ওকে না দেখতে পেয়ে আমি ভাইয়ের সঙ্গে পাড়ায় খুঁজতে গেলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। ওকে না পেয়ে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল। পাঁচ-ছয়মাস হয়ে গেল ও হারিয়ে গেছে। আমি এখনোও ভাবি— ও আবার লেজ নাড়তে নাড়তে আমার কাছে আসবে সেই ছোটোবেলার মতো।

অগ্নিদীপ্ত দে, নবম শ্রেণী, হরিদেবপুর, কল-৮২ ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) জ ম জা মে	(১) তা য় হা স ত্রী যা
(২) র ভি স্ত প্র	(২) ণ গ রা র ত্রি জা

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অতিচালাক (২) আদেশনামা

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অনুমোদনযোগ্য (২) ইতিহাসবিখ্যাত

উত্তরদাতার নাম

(১) স্বরাজ সরকার, রাজনগর, কালিয়াচক, মালদা। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা (৩) ইলা মুখার্জি, আদ্রা, পুরুলিয়া। (৪) মধুরিমা মহন্ত, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

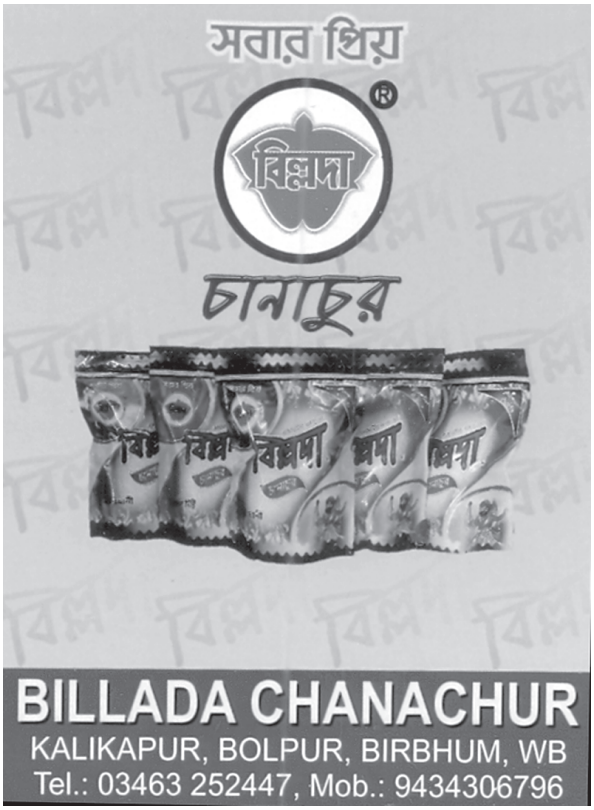

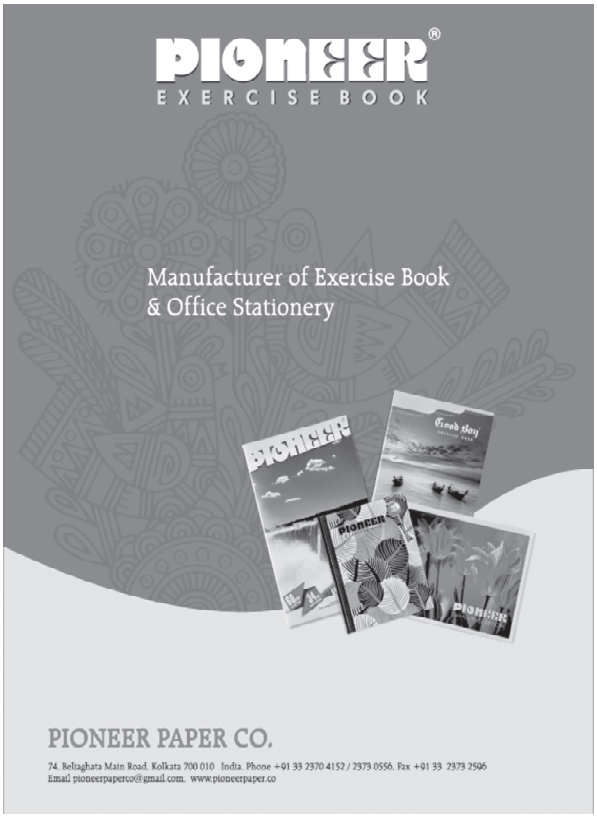

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে একটি মূল্যবান পাথেয়

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

শুভবুদ্ধি সমাচ্ছন্ন চারপাশে গুপ্ত কুমন্ত্রণা, একটি রুমাল শুধু ডেসডিমনা হারিয়ে ফেলো না।

কোনো সমাজে শিক্ষিত মানুষজন যখন ঋজু মেরুদণ্ডের না হয়ে অযোগ্য শাসকের দাক্ষিণ্যভোগী ও অনুরঞ্জনের পৃথুলতায় আক্রান্ত হয় তখনই ডেসডিমনার রুমালটি হারানোর আশঙ্কা বাড়ে। ধ্বংসের পথে চলার ব্রত নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কথাটা ভেবে দেখার মতো। তবুও আশান্বিত হতে হয় যখন অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধরের লেখা 'দেশ রাজনীতি ধর্ম'-এর মতো বই হাতে আসে। পুলকবাবু এই বাঙ্গলায় হাতে গোনা সেই প্রাজ্ঞ মানুষজনের একজন যিনি প্রয়াত অধ্যাপক অম্লান দত্তর চিন্তাপ্রসূত গণমুক্তি পরিষদের ফৌজি হয়ে বয়সকে উপেক্ষা করে এই শতকের শুরুতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন সুনন্দ সান্যাল, বিভূতিভূষণ নন্দী, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মানস ঘোষের মতো মানুষজন।

একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে লেখক বাইশটি প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন ব্রিটিশ সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের ধারণা, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশভাগ, গান্ধী ভাবনা, বামপন্থা, বাঙ্গালির বর্তমান সংকটের মতো বিষয়গুলিকে। প্রতিটি বিষয়ই বহুচর্চিত হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সেই সঙ্গে কলম ধরাটাও জরুরি। সেই কৃত্যটিই এখানে করা হয়েছে। বইটিতে দুটি গ্রন্থ সমালোচনা স্থান পেয়েছে। 'দেশভাগের মথিত বিষ ও হতভাগ্যের ভাগ্যাভিসার' শীর্ষক রচনাটি বিভাজিত স্বাধীনতা ও বাঙ্গালি জীবনে তার প্রভাব সংক্রান্ত এক মূল্যবান দলিল বিশেষ। পূর্ববঙ্গাগত বাঙ্গালি বামপন্থীরা দেশভাগ নিয়ে কাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র নির্মাণে যত ব্যস্ত থেকেছে তার ভগ্নাংশ সময় ব্যয় করেনি অশ্রু সিকদার বা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতো গ্রন্থ রচনায়। তাই কোনো খুশবন্ত সিংহের দেখা মেলেনি এই বঙ্গে। এই দিক দিয়ে কালিপদ মুখার্জির The Wounded Nation-এর উপর

লেখকের ভাষ্য একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। একই কথা বলা যায় সত্যের মুখোমুখি নামে গান্ধী ভাবনা সম্পর্কে। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি উদ্যোগে গান্ধীর বিপণনে এযাবৎ মরালিস্ট গান্ধীকে রাজনীতিক গান্ধী হিসেবে জনসমক্ষে হাজির করার চেষ্টা হয়েছে বলে বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আলোচিত লেখাটি তার মুখপাত ভাবা যায়। সেন্ট অগাস্টিন, রুসো, লুই ফিসার থেকে রোমাঁ রলাঁ, মোসলের ভাবনার সাহায্য নিয়ে লেখক গান্ধীর রহস্যময় অসামঞ্জস্যতাকে উন্মোচিত করেছেন। একই সঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ না করে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার যে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা গান্ধীর ছিল বলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন সেই দিকটি আলোচনায় এলে ভালো লাগত।

সদ্যপ্রয়াত লেখক বুদ্ধদেব গুহ জ্যোতি বসু সম্পর্কে বলেছিলেন, 'Why he will be honoured? He will never be honoured. He spoiled the state and party as well.' বইটিতে জ্যোতি বসু সংক্রান্ত দুটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম লেখাটিতে তিনি শহুরে বৈভব ও বিলেতবাসের সুযোগ পাওয়া আধা সামন্ততান্ত্রিক আবহে লালিত জ্যোতিবাবুর ইমেজ নির্মাণ ও বিনির্মাণে সফল। কিন্তু অন্য লেখাটিতে জ্যোতিবাবুর চাটপ্রুফ, শকপ্রুফ অ্যান্টি ম্যাগনেটিক দিকগুলো আলোচিত হলেও তাঁর বাঙ্গলাকে ইংরেজির প্রশ্নে ভাষাপঙ্গু করা ও মরিচঝাঁপির ঘটনা অনুল্লেখিত থেকে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং সেকুলারিজম সংক্রান্ত লেখাগুলি অনবদ্য। প্রতিটি লেখাই ঘটমান বিষয়কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাঠকের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে কিন্তু কোথাও লেখাগুলি অতিরিক্ত অ্যাকাডেমিক হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ও নকশাল আন্দোলন সংক্রান্ত লেখাগুলো ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে মূল্যবান পাথেয় হবে।

পরিশেষে একটা কথাই বলার তাহলো ২০২১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে আজকের বাঙ্গলায় অন্তঃসারশূন্য রাজনীতির ও একজন ব্যক্তির বিপজ্জনক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং তার আর্থ-সামাজিক প্রভাব কী ভবিষ্যৎ ডেকে আনছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হলে ভালো হতো। ইংরেজি ভাষাপঙ্গু যে বাঙ্গালি প্রজন্ম জ্যোতিবাবুর প্রশাসন চেয়েছিল, পুঁজিবিরোধী যে বন্ধ্যা নীতি বামেরা অনুসরণ করেছিল তার সঙ্গে সচেতন ভাবে ভোটের স্বার্থে রাজ্যের ধর্মীয় জনবিন্যাসের বদল এনে বর্তমান প্রশাসন যে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ আনতে চলেছে সে সম্পর্কে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ থাকলে গ্রন্থটি পূর্ণতা পেত।

পুস্তকের নাম : দেশ রাজনীতি ধর্ম।
লেখক : পুলকনারায়ণ ধর।
প্রাপ্তিস্থান : লোকনাথ এডুকেশন অ্যান্ড পাবলিসার্স। ১২৪ বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩। পৃষ্ঠা : ২৭৯।
মূল্য : ৩০০.০০।

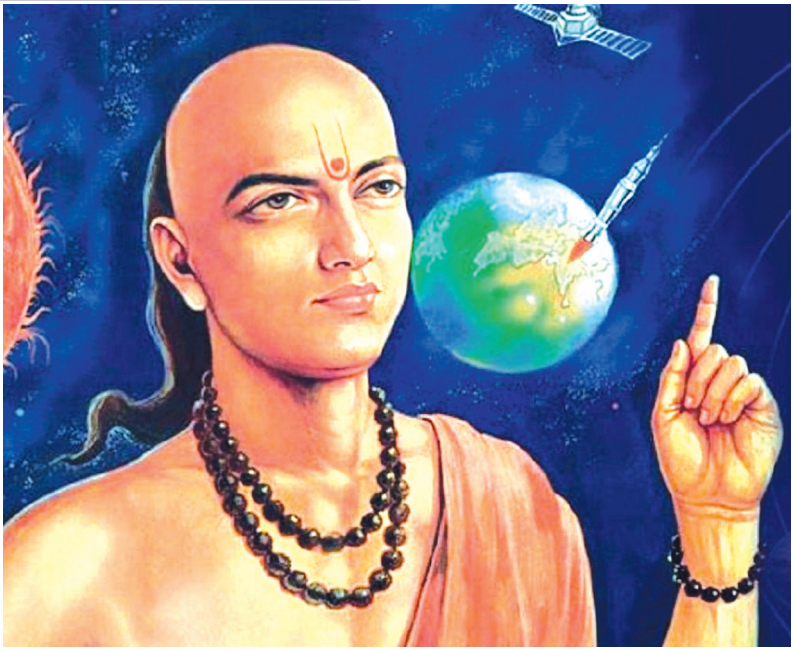

ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে জ্ঞানবিজ্ঞানের ঝলক

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

যখন পশ্চিমি দেশগুলো বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার অন্ধকারে ডুবে ছিল, তখন একমাত্র ভারতের জ্ঞানের প্রদীপ দীপ্তমান ছিল। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের অর্জিত জ্ঞান লিখে রেখে বা শিষ্যপরম্পরায় বলে গেছেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, ভারতের সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এবং চর্চার অভাবে সেই সব জ্ঞান বিস্মৃতপ্রায়। যার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলোর থেকে ভারত পিছিয়ে পড়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু নমুনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বেদে সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :

যত্ ত্বা সূর্য স্বর্ভানু স্তমবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ।।
—ঋগবেদ ০৫/৪০/০৫

অর্থ : হে সূর্য, যাকে (চাঁদ) তুমি তোমার নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করেছ, তাঁর (চাঁদের) দ্বারা যখন তুমি আচ্ছাদিত হও, তখন আকস্মিক অন্ধকারে পৃথিবী ভীত হয়।

সূর্যকে সমস্ত গ্রহ পরিক্রমণ করে, বেদে তার উল্লেখ্য :

'পঞ্চারচে পরিবর্তমানে তস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।'
—ঋগবেদ ১/১৬৪/১৩

অর্থ : পৃথিবীর-সহ সমস্ত গ্রহ নিজ অক্ষের চারিদিকে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে।

হনুমানচল্লিশাতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব :

অনেকেই জানেন যে হনুমানচল্লিশাতে একটি পঙ্‌ক্তিতে বলা আছে—

'যুগ সহস্র যোজন পর ভানু।
লীল্যো তাই মধুর ফল জানু।।

১ যুগ = ১২০০০ বছর। ১ সহস্র = ১০০০। ১ যোজন = ৮ মাইল।

যুগ × সহস্র × যোজন = এক ভানু

১২০০০ × ১০০০ × ৮ = ৯৬০০০০০০মাইল

১ মাইল = ১.৬ কিমি। ∴ ৯৬০০০০০০ মাইল = ৯৬০০০০০০ × ১.৬ কিমি। = ১৫৩৬০০০০০ কিমি।

এটিই হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। নাসা বলেছে এটাই পৃথিবী থেকে সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব।

বীর হনুমান ছোটোবেলায় সূর্যকে মধুর ফল ভেবে খাবার জন্য লাফ দিয়েছিল। এটি আশ্চর্যজনক মনে হলেও অর্থবহ বর্তমান যুগেও সত্য।

বেদে উল্লেখিত সূর্যের নিজ অক্ষের উপর আবর্তন ও পরিক্রমণ

যজুর্বেদে ৩৩/৪৩ নং মন্ত্রে উল্লেখ আছে—

সূর্য তার গ্রহদের নিয়ে (ছিন্ন অংশ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় নিজ কক্ষপথে ও নিজের অক্ষে প্রদক্ষিণ করে।

চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ, নক্ষত্রবৃত্ত, রাশিচক্র, জোয়ার-ভাটাদি তত্ত্ব, তিথি-বার ইত্যাদির ব্যবস্থাচক্র প্রভৃতি ঋষিরাই প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবী যে গোলাকার তা ঋষিগণ বহুপূর্বে আবিষ্কার ছিলেন, যথা—

'কপিত্থ-ফলবৎ বিশ্বং
দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্।' —নক্ষত্রকল্প

অর্থাৎ, পৃথিবী কপিত্থফল অর্থাৎ কয়েতবেলের মতো গোলাকার এবং উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।

'সর্ব্বতঃ

পর্ব্বতারাম-গ্রাম-চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।

কদম্ব-কেশরগ্রন্থিকেশর-প্রসবৈরিব।।'

—সিদ্ধান্ত শিরোমণি

অর্থাৎ, কদম্ব যেমন গোলাকার ও কেসরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ এই পৃথিবীও গোলাকার এবং সর্ব্বদিকেই গ্রাম, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ-নদী, সমুদ্র ইত্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পৃথিবীর যে গতি বিদ্যমান তা গ্রিসদেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের এবং ইটালি দেশীয় কোপারনিকাসেরও বহু পূর্বে আর্যভট্ট বলে গিয়েছিলেন—

'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।' —আর্যভট্ট

অর্থাৎ পৃথিবী চলছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন স্থির রয়েছে।

ভপঞ্জরঃ স্থিরো
ভুরেবাবৃত্ত্যা-বৃত্ত্যা-প্রতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাম।। —আর্য্যভট্ট

ভপঞ্জ অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র স্থির। কিন্তু পৃথিবী বারংবার আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক উদায়স্ত সম্পাদন করছে।

—এই গতিবিচার দ্বারা সূর্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সময়ের তারতম্য হয় তাও পশ্চিমি পণ্ডিতদের বহু পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ আবিষ্কার করেছেন—

'লঙ্কাপুরেঽকস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটি-পুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃস্যাৎ
রোমকে রাত্রিদলং তদৈব।।'

অর্থাৎ লঙ্কায় যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিপুরীতে দ্বিপ্রহর বেলা, আর যখন লঙ্কার অধোভাগে সিদ্ধপুরে সূর্য অস্তগমনোন্মুখী তখন রোমদেশে রাত্রিকাল।

পৃথিবী যে শূন্যমণ্ডলে অবস্থিত এবং পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে তা নিউটন জন্মগ্রহণ করবার বহু পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ আবিষ্কার করেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উল্লেখ রয়েছে—

'ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।'

অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবী শূন্যমণ্ডলে অবস্থান করছে।

ভাস্করাচার্য তার সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে লিখেছেন—

'নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতিহাস্য পৃষ্ঠে।

নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ
সদনুজমনুজা-দিত্যদৈত্যং সমন্ত্যং।।'

অর্থাৎ পৃথিবী বিনা আধারে স্বীয় শক্তিদ্বারা আকাশমণ্ডলীতে অবস্থান করছে। এরই পৃষ্ঠে চতুর্দিকে দেব, দানব, মানবাদি সমস্ত কিছু বসবাস করছে।

মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে ভাস্করাচার্য তার বিখ্যাত 'গোলাধ্যায়'-এ লিখেছেন—

'আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যত্
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক্বপতত্বিয়ংখে।।'

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তি-বিশিষ্টা। কারণ কোনো গুরুভার বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করলে পৃথিবী নিজ শক্তি দিয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আমরা মনে করি যেন তা পতিত হচ্ছে। চারিদিকেই সমান আকাশ, কাজেই পৃথিবী ছাড়া পড়বে কোথায়?

আর্যভট্টও লিখেছেন—

'আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহি যৎ তয়া
প্রক্ষিপাতে তৎ তয়া ধার্য্যতে।'

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি বিশিষ্টা। কারণ যা কিছু ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হয় তাই আকর্ষণশক্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করে।

শাস্ত্রের গুহ্য মর্ম্ম বুঝতে না পেরে আমরা অনেকে রাহু ও কেতুকে দৈত্য মনে করি এবং এই দৈত্যদ্বয় চন্দ্র-সূর্যকে মাঝে মাঝে গ্রাস করে এবং সেই জন্যই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে বহু পূর্বে উল্লেখ রয়েছে—

'পর্ব্বকালে তু সংপ্রাপ্তে
চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িস্যসি।
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং
চন্দ্রগোঽকং কদাচন।"

পর্ব্বকালে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিকালে এবং অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধিকালে রাহুরূপ ছায়া চন্দ্র সূর্যকে আচ্ছাদন করে। সেই জন্যই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।

সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

'ছাদকো ভাস্করস্যেন্দু
-অধঃস্থো ঘনবস্তুবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রঙ্মুখশ্চন্দ্রো
বিশত্যস্য ভবেদসৌ।।

—সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৪।৯

জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে—

'স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাৎ উদ্রেকি সলিলং যথা।

তমেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম।।

ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।

উদায়াস্ত ময়েম্বিন্দোঃ পক্ষয়ো শুক্ল কৃষ্ণয়োঃ।।

—বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৯০-৯১

অর্থ : জোয়ার-ভাটায় প্রকৃতপক্ষে জলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। হাঁড়িতে জল চড়িয়ে আগুনের উত্তাপ দিলে জল যেমন ফেঁপে উপরের দিকে ওঠে, সেইরকম শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্র কলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-জলেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

এইসব বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচিত বিষয় থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতির দিক থেকে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ছিল অনেক বেশি উন্নত।□

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের জন্য নতুন সুবিধা

সংবাদদাতা।। কাশী বিশ্বনাথ ধামের নবনির্মিত কমপ্লেক্সটি কেবল একটি বিশাল ভবন নয়, এটি ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতির, আধ্যাত্মিকতার ও ঐতিহ্যের প্রতীক। আগে এখানে মন্দিরের পরিসর ছিল মাত্র তিন হাজার বর্গ ফুট, এখন তা প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ হয়েছে। এখন মন্দির ও মন্দির চত্বরে ৫০ থেকে ৭৫ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সরাসরি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। জলসেন ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট ও ললিতা ঘাটে স্নান করে ভক্তরা সরাসরি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। শহরে তিনটি যাত্রী সুবিধা কেন্দ্রে ভক্তরা বিশ্রাম এবং তাদের মালপত্র নিরাপদে রাখার সুবিধা পাবেন। শিল্প-সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত কাশীতে শিল্পীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। দ্বিতল ভবনটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে।

বিশ্বনাথ ধামে আসা ভক্তদের জন্য বৈদিক কেন্দ্রটি ধ্যান ও যোগ কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক পুস্তক কেন্দ্রটি বাইরে থেকে আসা ভক্তদের জন্য ধর্মীয় পুস্তক কেন্দ্র হবে।। ভক্তদের জন্য বাবার ভোগশালা নির্মণ করা হয়েছে। এখানে ১৫০ জন ভক্ত একসঙ্গে বাবার প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। তৈরি হয়েছে মুমুক্ষু ভবন। ভবন থেকে মাত্র ১০০ ধাপ দূরে রয়েছে মহাশ্মশান মণিকর্ণিকা ঘাট। বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশের জন্য চারটি বিশাল প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পুরো ধাম এলাকায় নজরদারি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 'একটি জেলা একটি পণ্য' এবং হস্তশিল্প পণ্যের দোকান এবং ফুড কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গ ও বয়স্কদের চলাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাম্প ও এসকেলেটরের মতো আধুনিক সুবিধা থাকবে।

দেশব্যাপী স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি 'স্বাধীনতার ডিজিটাল উৎসব' চালু করেছেন। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিটি দিন একটি লক্ষ্যের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি ২০২১-এর ৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতার ডিজিটাল উৎসবে 'স্বচ্ছ ভারত লোগো' নির্মাণের জন্য অনন্ত গোপাল খাসওয়ারদারকে সংবর্ধনা জানান। তিনি '১০০ কোটি টিকাদান লোগো'-র জন্য ইয়াসিন হারুন সুদেসারার, 'লোকপাল লোগো'-র জন্য প্রশান্ত মিশ্র, বাঁশ মিশন লোগো'-র জন্য সাই রাম গৌর এডিজি এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া লোগো'-র জন্য রাণা ভৌমিকের প্রশংসা করেন।

মাই গভ সাথীস, যারা কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন সক্রিয়ভাবে সেবা প্রদান করেছেন তাঁদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনে একটি পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স কোম্পানি আরইসি লিমিটেড অসমের কামরুপ জেলার সোনাপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ উৎসবের আয়োজন করেছে।

বিআরও মোটর সাইকেল ক্যাম্পেন ভারত @৭৫ ভারতের চার কোণে ভ্রমণ করে জাতীয় সংহতি, দেশ গঠন এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন করছে। অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসেবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনজাতি সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনজাতি মানুষদের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাফল্য উদ্‌যাপন করছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অধীনে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক তাদের অনুষ্ঠানে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ৮৬ জন জনজাতি উদ্যোক্তাকে সম্মানিত করেছে। পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্টের সহযোগিতায় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে।

প্রহসন আর ভাঁওতা দিয়েই চলছে এই রাজ্যের সরকার

বিশ্বপ্রিয় দাস

আবার প্রহসন। প্রায় এক বছর পর বেরুল প্রাথমিকের টেটের ফলাফল। আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হলেন মাত্র নয় হাজারের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। আর যারা এতদিন ধরে চাকরি প্রার্থী হিসেবে নানা আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, তাদের কপালে জুটল একরাশ বঞ্চনা, সঙ্গে ভাঁওতা ফ্রি। কেন এই শব্দটি ব্যবহার করা হলো তার একটা সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। এবার ফলাফল প্রকাশ করার মুহূর্তে প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতির গলায় একটি কথা শোনা গেল, যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি করার আবেদনের যোগ্য হলেন। এতদিন যারা ভাবছিলেন টেট পাশ করলেই চাকরি, তাদের সেই ভাবনায় এক লহমায় জল ঢেলে দিল রাজ্যের সরকার। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর প্রতি এত বড়ো ভাঁওতা মনে হয় এর আগে হয়নি। রাজ্য সরকারকে স্বস্তি দিয়েছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজার প্রার্থীর পরীক্ষা না দেওয়া। বাকি যারা টেট দিয়েছিলেন তাদের মনে ছিল একরাশ উৎকণ্ঠা সমেত আশা। একটা চাকরির জন্য সেই আশায় রাস্তায়ও নেমেছিলেন ভবিষ্যতের শিক্ষকরা। সরকারের বাহুবলীরা দমন করেছিল তাদের সেই আন্দোলনকে। অবশেষে সরকারি ভাষায় প্রায় এক বছরের চেষ্টায় স্বচ্ছ একটি ফলাফল ঘোষণা করল সরকার। যেখানে রয়েছে ভাঁওতার স্বচ্ছতায় মোড়া একটা বঞ্চনার পাণ্ডুলিপি।

এবারে আসা যাক রাজ্যের যুব সমাজের খাসতালুকে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা এবং তারপর মহামনিবের কিছু উক্তি প্রসঙ্গে। এখন তিনিই রাজ্যের শাসকদলেন একমাত্র মুখ। তিনিই প্রবক্তা। তিনিই নিয়ন্ত্রক। বাকি সবাই মানে অন্য নেতারা তাঁর কাছে প্রজাসুলভ। আর তার মানে যুবরাজের কথাতেই রাজ্যের শাসকদলের ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে এখন। ফলে তিনিই বর্তমানে সুপ্রিম সুপ্রিমো। ডায়মন্ডহারবারে এমপি কাপের ফাইনালের দিন যে মোচ্ছব তিনি করলেন তাতে প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই মোচ্ছবের টাকা এল কোথা থেকে? এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম সেদিন যে হয়েছিল জলসা শোনার জন্য, সেটি কোন কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে হয়েছিল? একথা বা প্রশ্ন এই রাজ্যে তোলা যাবে না।

রাজ্যের মানুষ এখন ব্যানার্জি পরিবারের কৃপায় বসবাস করছেন এই কথাটা তাদের পক্ষ থেকে বারে বারে প্রমাণ করা হয়েছে। কখনো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামে ভিক্ষে দেওয়া, কখনো অন্য কোনো নামে সাহায্য। একেবারে ভিখিরি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মানুষকে। কোথাও কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে না বা চেষ্টা করাও হচ্ছে না কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরির। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থায় পঙ্গুত্বের কথা যেমন তোলা হচ্ছে, চপ আর ঢপ শিল্পের একটা স্বপ্নও ঘুরছে রাজ্যর আনাচে কানাচে। বাস্তবে এর প্রতিফলন নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে দিনের পর দিন। তবু মানুষের জ্ঞানচক্ষু খোলে না ভাঁওতাবাজদের পাল্লায় পড়ে।

এবারে আসা যাক শেষ পর্বে। এখন রাজ্যে করোনা অতিমারির প্রবল ঢেউ। পুরোপুরি এই ঢেউকে সামলাতে ব্যর্থ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। সংক্রমণের সুনামিতে রাজ্যের ফ্রন্টলাইন যোদ্ধারা একেবারেই কুপোকাত। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে নার্স করোনা সংক্রমণের ধাক্কায় একেবারেই ধরাশায়ী। ফলে অবস্থাটা যে কী তা সহজেই অনুমেয়। এদিকে রাজ্য সরকার আবার একটা গিমিক দিল। সমস্ত করোনা আক্রান্তকে নাকি ফল পাঠাচ্ছে সরকার। কতজন করোনা আক্রান্ত পেয়েছেন সেই ফলের ঝুড়ি, সেই হিসেব পাওয়া যাবে না কোনো দিন। এদিকে এই খাতে রাজ্যের কোষাগার যে অনেকটাই খালি হয়ে যাচ্ছে, সেই প্রশ্ন কে তুলবে? সাধারণ মানুষ যাদের সত্যিই প্রয়োজন আছে ফলের, সেইসব করোনা আক্রান্তরা কি পেয়েছেন এই ফল? উত্তর আসবে না। যুক্তি অবশ্য আছে। প্রতিদিন যদি গড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার ছোঁয়, তাহলে এত ফলের জোগান আসবে কোথা থেকে? সেই প্রশ্ন অবশ্য উঠছে শাসকদলের অভ্যন্তরেই একটি অংশ থেকে। কেননা তাদের এলাকায় অনেক আক্রান্তই পাননি এই ফলের ঝুড়ি। জবাবদিহি করতে হচ্ছে তাদের। উঁচুতলায় জানালেও লাভ হয়নি কিছুই। ফলে সেই কথাটাই আবারও আসছে সামনে, ভাঁওতা আর ভাঁওতা, যা এই রাজ্য সরকারের সফলতার একমাত্র রাস্তা। □

পরলোকে প্রদ্যুৎ কুমার মৈত্র (নাড়ুদা)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যুৎ কুমার মৈত্র (নাড়ুদা) দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, বউদি, ১ পুত্র ,১ কন্যা, নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন ১৯৮০ সালে। ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ব রেলের আধিকারিক পদে অবসর গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের মহকুমা কার্যবাহ থেকে বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। তৎকালীন প্রচারক অনন্তলাল সোনীর সঙ্গে তাঁদের বাড়ির সকলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর দাদা প্রণব কুমার মৈত্র বেশ কয়েক বছর ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ছিলেন। ৬ বছর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রান্ত কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংযোজন।। বিজয় আঢ্য।। নাড়ুদার সঙ্গে এই প্রতিবেদকের সম্পর্ক বছর চল্লিশের উপর, সেই আশির দশক থেকে।সৌজন্যে অনন্তলাল সোনী। তখন বালিভরার রাস্তাঘাট কাঁচা, সাইকেল, রিকশা ভরসা। নাড়ুদার মা তখন বেঁচে আছেন। মেয়ে টুপাই, ছেলে বাপ্পাও খুব ছোটো। জামার পাশপকেটে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ভয় দেখানো যেত। বড়দা, নাড়ুদা, বউদিরা মিলে বেশ আনন্দের সংসার। আমরাও সেই আনন্দের ভাগীদার। সবাই একমনা হলে যা হয় আর কী। এই পরিবারের সঙ্গে যাদের গভীর সম্পর্ক তাদের মধ্যে নন্দলাল কাট, শঙ্কর বাগ, রমাপদ পাল, রাসবিহারী ভড় প্রমুখ। কথা প্রসঙ্গে জেনেছি, নাড়ুদার জন্ম ১৯৪৫ সালের ৩ মার্চ। বাবা প্রফুল্ল কুমার মৈত্র, মা নির্মল রানি মৈত্র। নাড়ুদা ও তাঁর দাদা একই সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। নাড়ুদা ১৯৮৩ সালে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করেন। মহকুমা, জেলা, বিভাগ থেকে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রান্ত কার্যবাহ হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালে রামমন্দির করসেবায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের করসেবকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যখন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম নিয়ে অনেক রক্ত ঝরছিল, তখন দিল্লি থেকে 'জাস্টিস ফর পিপল' নামে একটি তদন্তকারী দল পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, সেই দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ছিল নাড়ুদার উপর। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনাখালিতে জেহাদিদের আক্রমণে ৪ জন স্বয়ংসেবক নিহত হলে রাজ্যজুড়ে যে প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ শুরু হয়, তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল।

নাড়ুদার সঙ্গে শেষ কথা হয় মাস ছয়েক আগে। ফোনের ওপারে তিনি অঝোরে কাঁদছেন নন্দলাল কাটের মৃত্যুসংবাদ শুনে। এবারে পুজোর সময় রোগশয্যায় শায়িত নাড়ুদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই শেষ দেখা। □

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মুখ্য মার্গ প্রমুখ গৌতম মণ্ডলের পিতৃদেব গোপাল চন্দ্র মণ্ডল গত ৭ জানুয়ারি নদীয়া জেলার পলাশীপাড়া খণ্ডের সাহেবনগর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল। ৮৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৬ পুত্র, ৫ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বড় পুত্র গৌতম মণ্ডল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সঙ্ঘের প্রচারক জীবনে রত আছেন।

ঃঃঃঃঃ

রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলার পূর্বতন জেলা ব্যবস্থাপ্রমুখ অনুপ কুমার মাইতির পিতৃদেব অরবিন্দ মাইতি গত ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ঃঃঃঃঃ

জলপাইগুড়ি জেলার জেলা শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ বাঞ্ছারাম (সঞ্জয়) মণ্ডল গত ৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সবধর্মিণী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। তিনি দক্ষিণবঙ্গে কয়েক বছর সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন।

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মঙ্গলবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা-৭৫' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (কালো/সাদা) ১৫০ টাকা

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (রঙিন) ২২৫ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

পূর্ণকালীন
গো-গ্রাম প্রশিক্ষক

সেবাভাবী এবং সম্পূর্ণ সময় দিয়ে বাংলার গ্রামে-গ্রামে গিয়ে চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক স্বয়ংসেবকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য সাম্মানিকের ব্যবস্থা করা হবে।

নাম....., বয়স (৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে).....

ঠিকানা....., ফোন নং.....

Whatsapp.....

শিক্ষা (ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ).....

সঙ্ঘ প্রবেশ (কমপক্ষে ১০ বছর)....., সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ.....

আবেদন ই-মেল-এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে— **GOSEVAPARIVAR@GMAIL.COM**

নিবেদক : গোসেবা পরিবার (ট্রাস্ট), কলকাতা

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২১।।